২৫ জুলাই ১৯৮৪ ■ আনন্দবাজার প্রকাশন ■ তিন টাকা

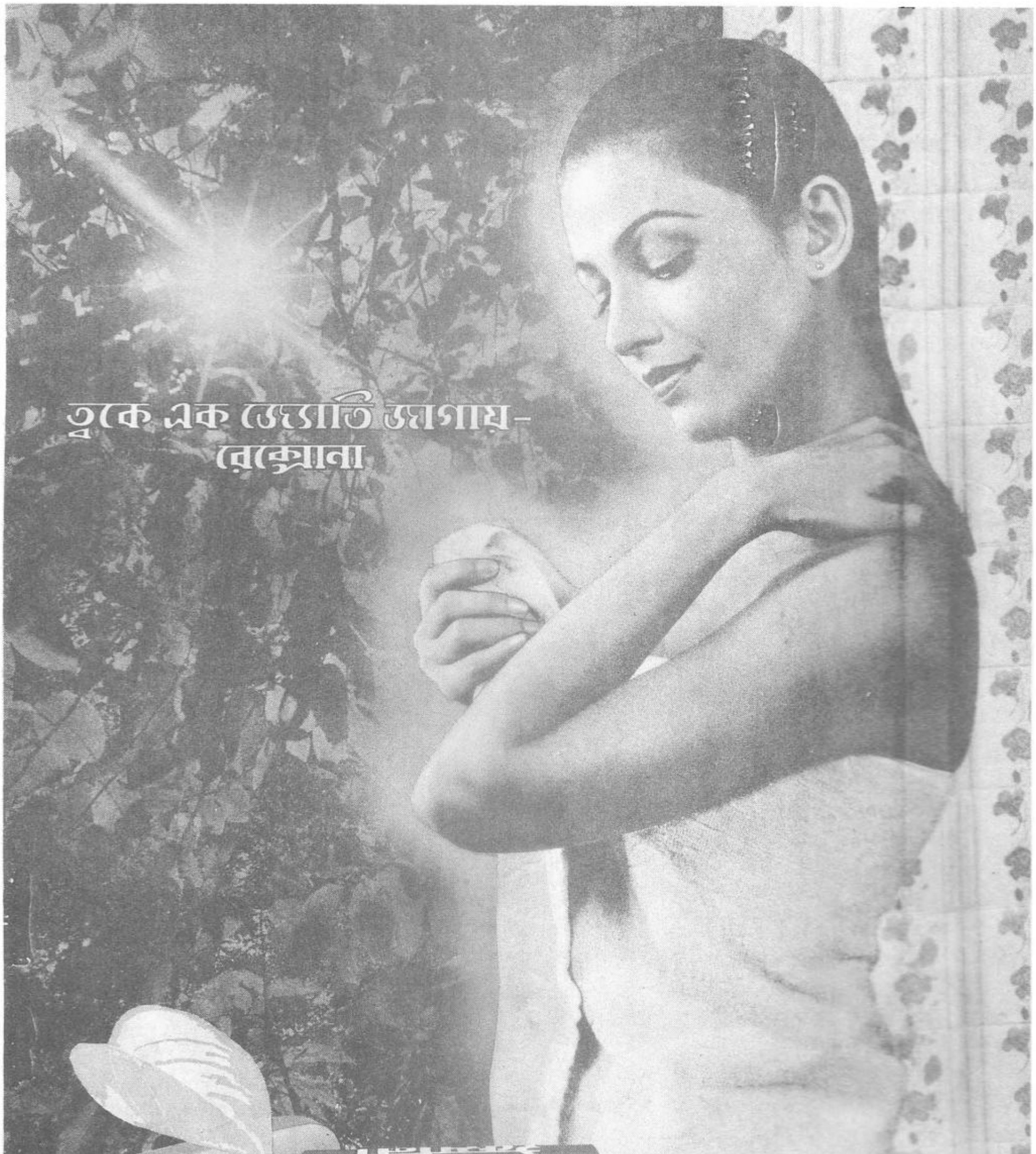


জ্যোতির্ময় ত্বক......এক এমন ত্বক যার
স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর,
আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই রেক্সোনা!
রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক
তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া, নর্ত্তিন বিশেষ,
লবঙ্গ আর টৌরিবিন্থ – যা আপনার ত্বকের
যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে

# রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RH 54 2416 BG

# আনন্দমেলা

৯ শ্রাবণ ১৩৯১ □ ২৫ জুলাই ১৯৮৪ □ ১০ বর্ষ ২ সংখ্যা

**সম্পূর্ণ উপন্যাস**
সন্ন্যাসীর থলে । মনোজ বসু ৩৪
**কবিতা ও ছড়া**
হাওয়া-দপ্তর । প্রেমেন্দ্র মিত্র ৭
অদ্ভুতুম । রত্নেশ্বর হাজরা ১২
ম্যাজিশিয়ান । আশা দেবী ২৩
সোঁদরবনের বাঘ । কমলেন্দু দাক্ষিত ২৭
সুয্যিমামার ছুটি । বিমলকান্তি বিশ্বাস ৫৯
**গল্প**
ফিরে আসা । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৫
নীলশার্ট, লালগেঞ্জি । অশোক বসু ৯
ভয় দেখানোর গল্প । রানা দাস ৪৬
**ধারাবাহিক উপন্যাস**
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩
**ইতিহাসের গল্প**
'ধ' চ 'ম' কওন কেলা । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৫
**স্মৃতিকথা**
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৫৭
**শার্লক হোম্‌সের গল্প**
বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৫১
**লেখাপড়া**
উত্তরপাড়া সরকারি হাইস্কুল । অপরাজিতা ২২
ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ২৩
বাংলা বলো । বাচস্পতি ২৫
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ২৫
**বিজ্ঞানবিচিত্রা**
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ১১
**খেলাধুলো**
ইউরোপীয় ফুটবলে ফ্রান্সই সেরা । সুব্রত সিংহ ৬৩
বিল ভোস চলে গেলেন । মণি শর্মা ৬৫
ওলিম্পিক-হকি ও ভারত । চন্দ্রভানু ৬৬
**চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স**
সদাশিব ৮, টিনটিন ২০-২১, টারজান ৩১
রোভার্সের রয় ৩২-৩৩, গাবলু ৪৮, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬২
**অন্যান্য আকর্ষণ**
ধাঁধা-মজা-শব্দসন্ধান ২৯-৩০
তোমাদের পাতা ৪৯-৫০
**প্রচ্ছদ** : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

**সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা


# বৃক্ষরোপণ

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন গাছই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন জমিয়েছে । তাই গাছের অনেক পরে প্রাণী ও তারও ঢের পরে মানুষ এসেছে এই পৃথিবীতে ।

আজ শহরগুলোতে অক্সিজেনের বড় অভাব পড়েছে । কলকারখানা, উনুন, মোটর গাড়ি ইত্যাদির ধোঁয়ায় শহরের মানুষ প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে না । শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকছে কার্বনডায়োক্সাইড, বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাস ও নানান রাসায়নিক যৌগ । এর প্রতিকার কি ? শহর থেকে বাস, মোটর, কলকারখানা তো তুলে দেওয়া যায় না । তবে ? বায়ুমণ্ডলের বিষপান করে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দিতে পারে একমাত্র গাছ, তাই আমাদের গাছ লাগাতে হবে । এবছর গোটা জুলাই মাসটা ধরেই বৃক্ষরোপণ উৎসব চললো কলকাতা ও কলকাতার শহরতলী জুড়ে । শুধু শহরতলীই নয়, গোটা রাজ্য জুড়েই সাড়া পড়ে গিয়েছিল বনসৃজনের, বৃক্ষরোপণের । রাজ্যের পৌরদপ্তর, সি এম ডি এ, বনসৃজন দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, শিক্ষা বিভাগ ও বিভিন্ন সংস্থাগুলি মিলে এবছর বর্ষায় বহু সংখ্যক গাছ লাগিয়েছেন । তোমরাও নিশ্চয়ই এই উৎসবে যোগ দিয়েছো । তবে গাছ লাগানোর ব্যাপারে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে । শুধু লাগালেই হল না । তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও কিন্তু নিতে হবে নিজেকে । বেড়া দিতে হবে । আগামী প্রখর গ্রীষ্মে জল দিতে হবে । পোকামাকড়, গরু ছাগল বা দুষ্টু বাচ্চাদের হাত থেকে গাছ বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে হবে । আমাদের পৌরমন্ত্রী এবার চীনদেশে গিয়েছিলেন । সেদেশে প্রত্যেকটি মানুষ পাঁচটি করে গাছ লাগান । তোমরা কটা করে গাছ লাগিয়েছো ? আর তার মধ্যে কটা গাছ বাঁচলো ?

**(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ)**

৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা ১৭ থেকে প্রচারিত

# ❝দিদা, দিদা, বাবা আজকে এতো দুষ্টুমি করছে কেন ?❞

❝কেন রে ছোটন কি করেছে ?❞

❝দেখ না ! লক্ষী ছেলের মত খাচ্ছে না।❞

❝পেট খারাপ হয়েছে যে। পেট খারাপ হলে হজম হয় না, তাই কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।❞

❝কিন্তু না খেলে যে গায়ে জোর পাবে না—আর কালকে বেরোবে কি করে ?❞

❝তুমি কিছু ভেবো না। আমি এমন জিনিস্ দেবো যা চট করে হজম হয়ে যাবে। জান সেটা কি ? ওই যে তুমি রোজ যেটা খাও !❞

❝জানি ! রবিনসন্স্ বার্লি।❞

❝ঠিক বলেছ। এই বার্লি খুব হাল্কা খাবার বলে চট করে হজম হয়। তাছাড়া খাঁটি বার্লির সব গুণই রবিনসন্স্ বার্লিতে আছে। তাই পেট খারাপ হলে ডাক্তারবাবুরাও রবিনসন্স্ বার্লি খেতে বলেন।❞

❝আচ্ছা দিদা . . .❞

❝আর কথা নয়। নাও এই এক গেলাস বার্লি বাবাকে দিয়ে এস দেখি ?❞

❝বাবা, বাবা, এই নাও তোমার রবিনসন্স্ বার্লি।❞

# রবিনসন্স্ বার্লি

## হালকা আহার আর সহজে হজমের পথ্য

LINTAS(C)/ROB/4/2416 BG

# ফিরে আসা

## সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

এই কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি থেমেছে। শেষ শীতের বৃষ্টি। চারপাশ ঘোলাটে। সন্ধে হয়ে এল। আমরা যে বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ি ছেড়ে এবার অন্য জায়গায় চলে যাব। মনে হয় সামনের মাসেই যেতে হবে। আমার দাদা খুব খেয়ালি মানুষ। কোনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকেন না। আজ এখানে, কাল সেখানে। কেউ বললে গানের সুরে উত্তর দেন, আমি এক যাযাবর।

আমাদের এই বাড়ির পাশে বেশ বড় একটা কারখানা আছে। অনেক লোক কাজ করে। এইমাত্র বাঁশি বেজেছে। এইবার ছুটি হবে। মিছিলের মতো সব যাবে বাড়ির সামনে দিয়ে। কলর-বলর করতে করতে।

জানালায় বসে লোক দেখতে বেশ লাগে। গেটের বাইরে হঠাৎ হইহই শুরু হল। সব মানুষ আটকে পড়েছে। ওদিক থেকে এদিকে আসতে পারছে না। ব্যাপারটা কী? সাপ বেরিয়েছে নাকি! বেশ-কিছুদিন আগে এই রকমই এক বর্ষায় আমাদের বাগান থেকে একটা ময়াল সাপ বেরিয়ে রাস্তা জুড়ে শুয়ে ছিল। নড়েও না চড়েও না। লোক-চলাচল বন্ধ। সবাই বলল, ব্যাটা ছাগল খেয়েছে, হজম না হলে নড়বে না।

দাদা আর আমি গেটের সামনে গিয়ে অবাক। বিশাল একটা কুকুর সামনের দুটো পা গেটের ওপর তুলে দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরের ভয়ে মানুষ আটকে পড়েছে। এদিকে আসার সাহস পাচ্ছে না।

কুকুরটা দেখেই দাদা বললেন, "অ্যালসেশিয়ান, ভাল জাতের কুকুর রে। কারুর পোষা ছিল, গলায় বেল্ট রয়েছে।"

"পোষা কুকুর এখানে এল কী করে?"

"মনে হয় ছাড়া পেয়ে বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছে।"

"কী হবে এখন?"

"কী আবার হবে? গেটটা খুলে দি। ভেতরে চলে আসুক।"

"তারপর?"

"কয়েক দিন থাকুক। তারপর যখন খোঁজ পড়বে, মালিক এসে নিয়ে যাবে। এসব কুকুরের দাম জানিস? জাতের কুকুর।"

দাদা গেটটা খুলতেই কুকুর ভেতরে চলে এল। রাস্তায় যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠলেন, "দেখবেন দাদা, কামড়ে না দেয়। ভীষণ ফেরোশাস কুকুর।"

দাদা হাসলেন। আমার দাদার ভীষণ সাহস। ইচ্ছে করলে বাঘ-ভাল্লুকও পুষতে পারেন। সেই হঠাৎ-বেরনো ময়াল সাপটাকে দু'হাত দিয়ে তুলে পথের ধারে সরিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বাগানে সাপের অভাব নেই।

কুকুরটা যেন আমাদের কতকালের পোষা। আপন মনে সোজা আমাদের বাড়ির ভেতরে চলে এল। উঠোন। উঠোন পেরিয়ে রক। রকে উঠে, হাত-পা ছড়িয়ে, ধপাস করে একপাশে শুয়ে পড়ল। ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

দাদা বললেন, "ওর খুব দুঃখু হয়েছে। বড়মানুষ গরিব হয়ে গেলে যেমন হয়। আমার মনে হয়, যারা পুষেছিল, তারা সামলাতে না পেরে ছেড়ে দিয়ে গেছে। এসব কুকুর পোষার কম খরচ! সুখের দিনে পুষেছিল, দুঃখের দিনে ছেড়ে দিয়ে গেছে।"

কুকুরটাকে দেখে মনে হল, অনেকদিন তেমন ভাল করে খাওয়াদাওয়া হয়নি। শুয়ে আছে, পেটটা যেন ভেতরে ঢুকে গেছে। চোখ দুটো যেন মরা-মরা। দুকোণে জল জমেছে। মুখটা রোগা হয়ে গেছে।

দু'হাত দূরে বসে আমি আর দাদা পর্যবেক্ষণ করছি। দাদা বললেন, "দ্যাখ, গরিবের দুঃখু তেমন গায়ে লাগে না। তারা দুঃখ পাবার জন্যেই জন্মায়। বড়লোক গরিব হয়ে গেলে সহ্য হয় না। চন্দননগরের বিশুবাবুকে মনে পড়ছে। গাড়ি, বাড়ি, বাগান, সব চলে গেল। কারবার লাটে উঠে গেল। শেষে অত বড় মানুষ বাজারে কাটা কাপড়ের দোকান করলেন। সেও

চলল না। শেষে মারাই গেলেন প্রায় বিনা-চিকিৎসায়। মারা যাবার কয়েকদিন আগে আমাকে বলেছিলেন, 'দুঃখু কোরো না পার্থ, এই হল মানুষের জীবন। এই সব আছে, এই কিছুই নেই। একদিন রুপোর থালায় সোনার চামচে, একদিন শালপাতায় শুকনো রুটি। দুঃখ আর সুখ, সুখ আর দুঃখ ঘুরে ঘুরে আসে।"

কুকুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখের দু'কোণে জল নেমেছে। দেখে আমারই কষ্ট হচ্ছে।

"দাদা, একটা রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছিয়ে দেবে ?"

"দাঁড়া, হঠাৎ গায়ে হাত দিয়ে দরকার নেই। সারা গাটাই তো মনে হয় শীতের বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। আগে একটু গরম দুধ খাওয়াই। জানিস তো, এরা দুধ আর মাংস ছাড়া কিছু খেতে পারে না।"

এক বাটি দুধ এনে সামনে রাখলুম। শুয়ে শুয়েই করুণ দৃষ্টিতে একবার দেখল। নাক টেনে দু'তিনবার গন্ধ নিল। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে চুকচুক করে খেতে লাগল। খায় আর আমাদের দিকে তাকায়। ন্যাজ নড়ছে। দু'চোখে জলের ধারা। নিমেষে একবাটি দুধ শেষ। খালি বাটিটা চেটেচুটে একেবারে সাফ। মনে হয় কিছুই হল না। আরও একবাটি হলে ভাল হত। আর দুধ নেই। সামান্য একটু পড়ে আছে চায়ের মতো। আনতে গেলে বউদি রাগ করবে।

দাদা বললেন, "শুয়ে পড়ো বাবু, এবার একটু বিশ্রাম করো। রাতে রুটি খাবে ? রুটি হোক ?"

কুকুর অদ্ভুত করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোণের দিকে সরে গিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। একটা ছেঁড়া বিছানার চাদর এনে আলতো করে গায়ে ফেলে দিলুম। বেশ যেন আরাম পেল। কতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে কে জানে।

কিছুক্ষণ পরে বউদি এসে কুকুরটাকে দেখে গেল। চোখ বুজে পড়ে আছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। চোখের কোল বেয়ে জল পড়ছে। বউদি বললে, "বয়েস হয়েছে, চোখে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। একটু ওষুধ, কি গরম সেঁক দিতে পারলে ভাল হত। কে এখন সাহস করে দেয়। যাই, ওর জন্যে খান-চোদ্দ রুটি বানাই'। তখন দেখলুম পেটটা একেবারে পড়ে আছে। পিঠে পেটে এক হয়ে গেছে।"

বউদি চলে যেতেই দাদা ডাকলেন, "বাবু।"

কুকুর চোখ মেলে তাকাল। একবার দেখে, সামান্য ন্যাজ নেড়ে আবার চোখ বুজে ফেলল। দাদার সে কী আনন্দ। "দেখলি, ডাকে সাড়া দিয়েছে ! বাবু নামটা মনে হয় পছন্দ হয়েছে খুব।"

শেষ মাস। দাদার হাত খালি। বাক্স-প্যাঁটরা, পকেট-মকেট হাতড়ে যা দু'চার টাকা বার হল, আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যা, মাংস কিনে আন। আজ অতিথির সম্মানে, আমাদের সকলের রুটি-মাংস হয়ে যাক।"

এমন বরাত, বাজারে যাবার পথে, দশকর্মা ভাণ্ডারের সামনে, অন্ধকারে একটা দশটাকার নোট কুড়িয়ে পেলুম। অন্যদিন হলে, মন্দিরে পুজো দিয়ে দিতুম। আজ টাকাটা পকেটে পুরে নিলুম। মাংস বেশি পরিমাণে কেনা যাবে। কাল কিছুটা রেখে দিলে আমাদের অতিথি খেয়ে বাঁচবে।

রাত নটা নাগাদ বউদি বাবুকে খেতে দিল, রান্নাঘরের রকের সামনে। চোদ্দখানা রুটি আর মাংস। কুকুরের নাম বাবুই হয়ে গেল। বাবু একটু করে খায়, আর আমাদের দিকে তাকায়। কৃতজ্ঞতায় রোগা মুখের চেহারাটাই কেমন যেন হয়ে গেছে। দাদা বললেন, "কুকুরের ভাষা থাকলে দেখতিস, আমাদের হয়তো বৃদ্ধমানুষের মতো আশীর্বাদ করত।"

কতদিন ভালভাবে খেতে পায়নি। ঢোঁক গিলতে অসুবিধে হচ্ছে। বউদি জল দিয়ে গেল। একবার জল খায়, একবার রুটি খায়। খেয়ে তার যত না তৃপ্তি, আমাদের তৃপ্তি তার চেয়ে ঢের বেশি। খাইয়ে এত আনন্দ পাওয়া যায় জানা ছিল না।

সারা রাত সেই কুকুর শুয়ে রইল কোণে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। চারপাশে কুকুর ডাকছে। বাইরের কুকুর ডাকলে, ঘরের কুকুরও চিৎকার করে। এ কেন ডাকছে না ? প্রথমে দাদাই সন্দেহ করলেন। "সেই থেকে একবারও কেন ডাকল না বল তো ? মনে হয় মরে যাবে। বাঁচবে না।"

দুটো দিন চলে গেল। কুকুরের গলা দিয়ে কোনো শব্দ বার হল না। কৃতজ্ঞতা মাখানো, জলভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। ন্যাজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। সামনের দুটো থাবায় মুখ রেখে শুয়ে থাকে। জোরে বাতাস দিলে দু'কান খাড়া করে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। ডাকে না। মুখ দিয়ে সামান্যতম শব্দও বেরোয় না।

আমরা তো সে-রকম বড়লোক নই। ভাল ডাক্তার ডাকার অনেক খরচ। অনেক বলে-কয়ে, বুঝিয়ে দাদা আমাদের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এলেন। কাছে যাবার সাহস নেই। যদি কামড়ায়। কে বোঝাবে এ কুকুর কামড়াবার কুকুর নয়।

অনেকক্ষণ দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, "শক পেয়েছে। এমন কিছু দেখেছে, যা দেখে এই ডাক বন্ধ হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনা। খুন, আত্মহত্যা, অগ্নিকাণ্ড। যাই হোক, স্নায়ুর ওষুধ দিয়ে যাই। কাজ হবে কি-না জানি না।"

এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার দিন এগিয়ে আসছে। আমাদের বাড়িঅলা এক খ্রিস্টান ভদ্রলোক। তিনি বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যাবেন ছেলের কাছে। আমরা এবার বাড়ি পেয়েছি শহরের একেবারে বিপরীত প্রান্তে। এখান থেকে বহুদূরে।

হোমিওপ্যাথিক ওষুধে খুব একটা কাজ না হলেও, গলা দিয়ে এক ধরনের কুঁই কুঁই শব্দ বেরোতে শুরু করেছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, ওর অসহায়, নিরাশ্রিতের ভাবটা কাটলেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ও ভীষণ ভয় পেয়েছে। একটু যত্ন, আদর দাও, ওষুধ আর লাগবে না।

কুকুরটি আমাদের খুব চিনেছে। বউদি যা বলে তাই শোনে। অত বড় একটা প্রাণী, জাতে সায়েব, তবু কোনো অহঙ্কার নেই। আমি যখন পড়তে বসি, আমার পাশে এসে চুপটি করে শুয়ে থাকে। বউদি হয়তো রান্নাঘর থেকে ডাকল, বাবু, আয়, খেয়ে যা, অমনি ধীরে ধীরে উঠে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

একদিন রাতে দাদা বললেন, "কাল থেকে মালপত্র সরাতে আরম্ভ করব। একটা লরি কাল আসবে। প্রথমে ভারী মাল সব পাচার করে দেব। পরের দিন হালকা মাল নিয়ে আমরা সবাই একেবারে চলে যাব।"

"কুকুরটার কী হবে দাদা ?" আমার প্রশ্ন।

"কুকুর ?"

এতক্ষণ কুকুরের কথা কেউ ভাবেনি। দাদা বললেন, "ওকে তাহলে নিয়ে যেতে হয়। আমরা চলে গেলে ও থাকবে কোথায় ?"

বউদি অনেক ভেবে বলল, "ওসব ঝামেলা সঙ্গে না নেওয়াই ভাল। এত খোলামেলা জায়গা সেখানে নেই। এত বড় কুকুর নিয়ে সামলাবে কী করে ? খরচও তেমনি। বয়েস হয়েছে, ও আর বাঁচবে ক'দিন ?"

দাদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বউদির কথা মনে হয় পছন্দ হল না। আমারও পছন্দ হয়নি। খরচ তো সহজেই কমানো যায়। থাকতে থাকতে আমাদের মতোই ডালভাত খাওয়া অভ্যাস হয়ে যাবে। এ-বাড়িতে আজই আমাদের শেষ দিন। দাদা আজ নিজেই বাজারে গেলেন। কুকুরকে আজ ভাল করে খাওয়ানো হবে। তারপর তার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

দাদা বললেন, "সবাই বলছে আমরা যদি না থাকতুম তাহলে কী হত কুকুরটার ? যা হয় একটা কিছু হত।"

দাদা বললেন বটে ; কিন্তু দাদার মন যে মানছে না, মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়।

বেলা দুটোর সময় বউদি বাবুকে খেতে দিল, বাইরের বারান্দায়। চারপাশ মেঘভাঙা রোদে ঝলমল করছে। বাড়ির সব জিনিসই প্রায় চলে গেছে। ঘরদোর খালি-খালি। কথা বললে প্রতিধ্বনি হচ্ছে। খুব খিদে পেয়েছিল বাবুর। হাঁউ-হাঁউ করে নিমেষে সব খেয়ে নিল। সামনের থাবার ওপর মুখ রেখে বৃদ্ধের করুণ চোখে তাকিয়ে রইল বৃষ্টিভেজা সবুজ বাগানের দিকে। চলে যেতে হবে। আমাদের সকলেরই মন খারাপ। কুকুরটা আমাদের মন আরও খারাপ করে দিল।

রাতে আমাদের ভাল ঘুম হল না। বাইরে বাবুর থেকে-থেকে জল খাওয়ার চকচক শব্দ পাচ্ছি। তার সঙ্গে এই আমাদের শেষ রাত।

সকাল আটটায় আমাদের গাড়ি এসে গেল। টুকরো-টাকরা মালপত্র যা ছিল সব তোলা হয়ে গেছে, এইবার আমরা উঠে যাব। বাড়িঅলার লোকজন কখন আসবে কে জানে ! বাবু ন্যাজ নাড়তে-নাড়তে গেট অব্দি এসেছে। তাকে ভেতরে রেখে দাদা গেটটা বন্ধ করে দিলেন। আর ফিরে তাকানো নয়। মন খারাপ হয়ে যাবে। গাড়ি ছেড়ে দিল। বাবু এখনও তেমন ডাকতে পারে না। কুঁকুঁ শব্দ কানে এল।

দু'তিন মাইল চলে এসেছি। দাদা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। ড্রাইভার গাড়ি ঘোরান।

বউদির চোখেও জল টলটল। গাড়ি আবার ঘুরে এল গেটের সামনে। দাদা আর আমি লাফিয়ে নেমে এলুম। কুকুর বাগানে নেই। কোথায় গেল ?

আমাদের শূন্য শোবার ঘরের মাঝখানে চুপ করে বসে আছে বাবু। উদাস মুখ। ফ্যালফেলে চোখ। দাদাকে দেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ঘনঘন ন্যাজ নড়ছে। দাদার সামনে এসে মুখ তুলে দাঁড়াল। দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে।

দাদা ধরা গলায় বললেন, "চলো, বাবু, চলো আমাদের সঙ্গে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

# হাওয়া দপ্তর

## প্রেমেন্দ্র মিত্র

কী চাও ? কী চাও ?
ঠাণ্ডা, গরম, রোদ কি বৃষ্টি, ঝড় ?
ভাবনা কিসের ? আছে তো ওই
কল্পতরু আবহাওয়া-দপ্তর !

সকাল-বিকেল খবর শোনায়
কেমন গেছে দিনটা,
কেমন যাবে, তারও হদিস
দিয়ে ঘোচায় চিন্তা।

মনে শুধু রাখতে হবে,
ভাষাটা তার উলটো।
বৃষ্টি শুনে ধান বুনলে
হবে বিষম ভুল তো।

বৃষ্টি মানেই খটখটে রোদ,
খরা মানেই বৃষ্টি,
'নেই সতর্কবার্তা' মানে
কিছু অনাসৃষ্টি।

তাই তো ভাবি, সোজাসুজি
বৃষ্টি চেয়ে করল কি কেউ মানত্ ?
দেশ-ভাসানো বন্যাতে এই
দিচ্ছি সবাই ভুলের খেসারত ?

ছবি : দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

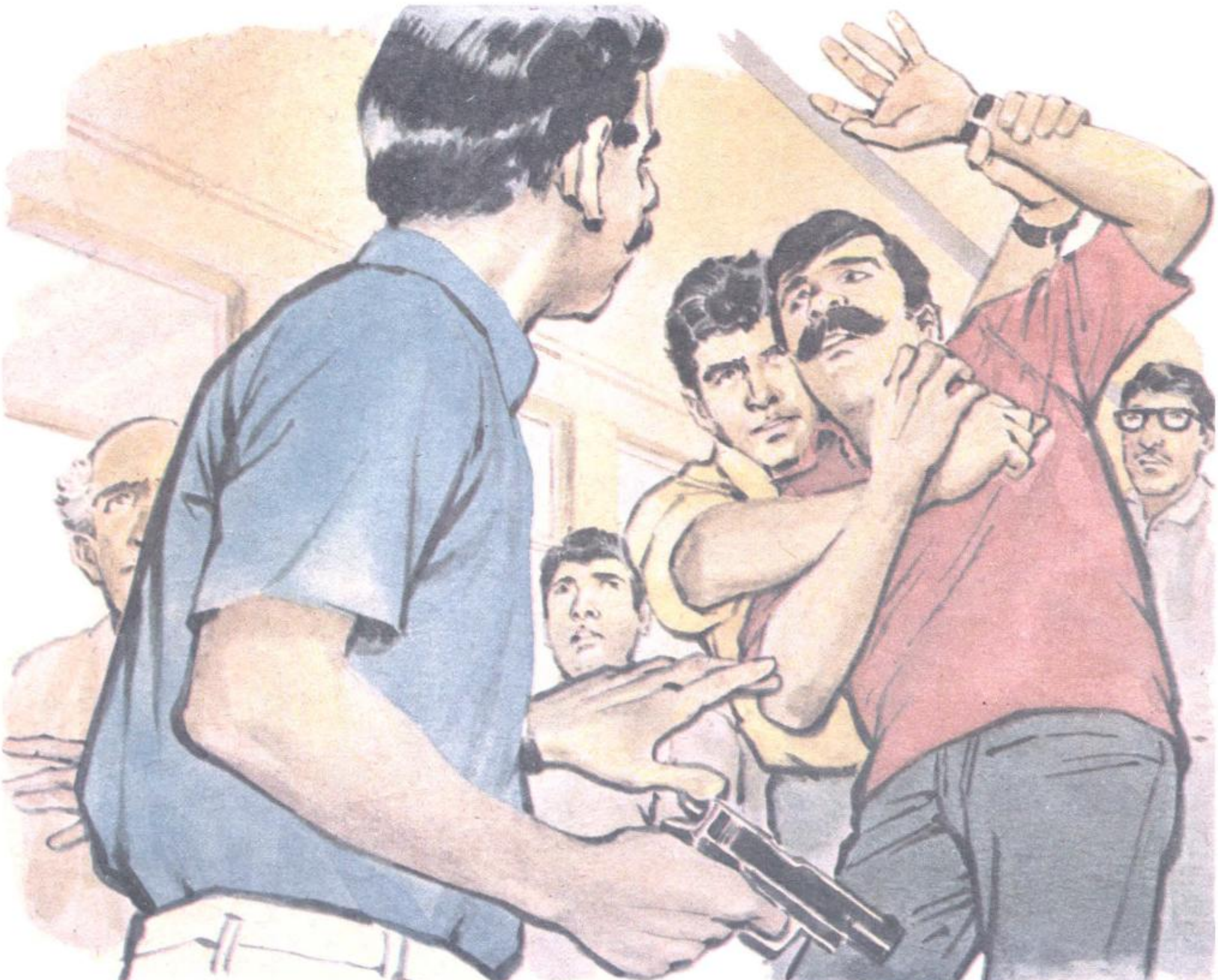

# নীলশার্ট, লালগেঞ্জি

অশোক বসু

মাঝারি বয়সের, নীলশার্ট পরা, মোটাসোটা লোকটা নিজেকে যতই স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করুক না কেন, আমি ঠিকই বুঝতে পারছিলাম ওগুলো সবই তার ওপর-ওপর সাজানো ব্যাপার। আমি আর ছোটকা যে-বাসে শিলিগুড়ি থেকে ফিরছিলাম, সেই বাসে সেও যাচ্ছিল। ঠিক আমাদের সামনের সারির সিটে জানলার ধারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। খবরের কাগজ পড়াটা যে নেহাতই একটা ভান, সেটা বুঝে নিতে আমার মোটেই অসুবিধে হচ্ছিল না। বেশ বুঝতে পারছিলাম সে ভেতরে ভেতরে কোনো চাপা উত্তেজনা বোধ করছে। কোনো স্টপে গাড়ি থামলেই সে সতর্ক হয়ে যাত্রীদের ওঠা-নামা লক্ষ করছিল। যেন ভয় পাওয়ার মতো কেউ আছে কি না দেখে নিচ্ছিল।

লোকটাকে দেখে এত কথা আমার মনে হত না, যদি না কয়েকদিন আগের শিলিগুড়ির সোনার দোকানের দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা আমার জানা থাকত। ওই ডাকাতিতে স্বর্ণময়ী জুয়েলারির দরোয়ান আর এক কর্মচারীকে খুন করে ডাকাতরা লাখখানেক টাকার সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়। কেউ ধরা না পড়লেও ছোটকার মুখে শুনেছিলাম ডাকাতরা শিলিগুড়ির আশেপাশের লোক বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

এতসব কথা ছোটকা কিন্তু জানত না। আমিও নীলশার্টের কথা ছোটকাকে এতক্ষণ বলিনি। কিন্তু বাসটা শিলিগুড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে ফুলবাড়ি আসতেই লোকটা যা কাণ্ড করল, ছোটকাকে না বলে থাকতে পারলাম না। ফুলবাড়িতে গাড়ি থামতেই সে উঠে দাঁড়াল, ব্যাগটা হাতে নিল, তারপর নামবে বলে সামনের দিকে যেতে গিয়েই একজনকে বাসে উঠতে দেখে থেমে গেল। আমি দেখলাম সে আবার নিজের জায়গায় চটপট বসে পড়ে কাগজটা ফের ব্যাগ থেকে বের করে নিয়ে নিজের মুখটা আড়াল করল। আর যাকে দেখে সে এত কাণ্ড করল, সেই লোকটা কিন্তু এসব কিছুই দেখেনি। বসবার জায়গা ছিল না বলে সে হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ছোটকার বয়েসি পাতলা চেহারার এই লোকটা কালো ফুলপ্যাণ্ট আর লালগেঞ্জি পরে থাকলেও আমি মনে মনে তাকে পুলিশের ড্রেস পরিয়ে দিয়ে দেখলাম যে দিব্যি মানিয়ে যাচ্ছে।

ছোটকা সামনের দিকে তাকিয়ে চাপাগলায় বলল, "কে, কোন লোকটার কথা বলছিস?"

আমি বললাম, "ওই যে জানলার ধারে বসে কাগজ পড়ছে। গুণ্ডা-গুণ্ডা দেখতে, নীলশার্ট..."

এপাশ থেকে লোকটার মুখ পুরো দেখা যাচ্ছিল না।

ছোটকা একটু ঝুঁকে দেখল। আর দেখেই ছোটকার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। অস্ফুট গলায় শুধু বলল, "আরে!"

মনে হল লোকটা খুব মার্কামারা। ছোটকা তাকে চিনে ফেলেছে। ছোটকার মুখ গম্ভীর। আমি কিছু বলবার আগেই বাসের সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আর পরে যে লোকটা উঠেছে?"

লালগেঞ্জি পরা লোকটাকেও তখন পুরো দেখা যাচ্ছিল না। গাড়িতে ভিড় বেশি বলে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। লালগেঞ্জির সামনে-পেছনে তখন অনেক লোক। এমনিতেই সময়টা বিকেলের শেষাশেষি, গাড়ির মধ্যে অল্প আলো, তবু আমি ভিড়ের মধ্যে থেকে লোকটাকে ঠিক খুঁজে নিয়ে ছোটকাকে দেখালাম।

"ওই যে, চশমাপরা লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লাল গেঞ্জি, ইয়া গোঁফ।"

তখনই লালগেঞ্জিকে এত ভিড়ের মধ্যে থেকেও ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। ছোটকা আমার পায়ে একটা ছোট্ট চিমটি কাটল। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমিও অমনি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ছোটকাও জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। যেন এতক্ষণ সে বাইরের দৃশ্য দেখতেই মগ্ন।

ছোটকা নিচু গলায় বলল, "গোঁফটা কিন্তু দেখবার মতো। আর্মির লোকদের এরকম গোঁফ থাকে।"

একটু পরে গাড়ির আলো জ্বলে উঠতেই আমি আবার সামনের দিকে তাকালাম। লালগেঞ্জির চোখ অন্যদিকে। জনে জনে যেন সন্ধানী-দৃষ্টি ফেলে দেখে নিচ্ছে, যাদের খুঁজছে তেমন কেউ আছে কি না। ছোটকার মুখে শুনেছিলাম পুলিশ নাকি হন্যে হয়ে এখন ডাকাতদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি সাবধান হয়ে গেলাম। কী জানি লোকটা যদি আবার দেখে যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি, তবে হয়তো আমাকেই কিছু সন্দেহ করে বসবে। থানা-পুলিশের নাম শুনলেই আমার বুকের ভেতর ঢিবঢিব করে।

ছোটকা ফিসফিস করে বলল, "ঠিক ধরেছিস তপু, খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার।" ছোটকা এবার নীলশার্টের দিকে তাকাল। তখনও নীলশার্টের মুখের সামনে খবরের কাগজটা ধরা। এত অল্প আলোতে যে কাগজের লেখাগুলো মোটেই ভাল করে পড়া যায় না, সেটা হয়তো তার খেয়ালই নেই। ছোটকা তার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "মনে হচ্ছে শিলিগুড়ির ডাকাতির কেসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে। না, কেসটা টেক-আপ করতে হচ্ছে তপু।"

আমি বুঝলাম ছোটকার মধ্যে দারুণ টেনশন এসে গেছে। শখের গোয়েন্দাগিরিতে ছোটকা ভীষণ উৎসাহী। যদিও কাগজে-কলমে এখনো কোনো গোয়েন্দাগিরিতে সে হাত দেয়নি, তবু মনে করে অদূরভবিষ্যতে সে নামকরা ডিটেকটিভ হয়ে উঠবে। হরদম সে ডিটেকটিভ বই পড়ে আর খবরের কাগজে খুন ডাকাতি চুরির খবর থাকলেই সে নিজের মনে-মনে অপরাধীর পেছনে ধাওয়া করে। ছোটকার যুক্তিগুলো অনেক সময় আমাকেও ভাবিয়ে তোলে।

আমার মধ্যেও তখন বিরাট উত্তেজনা। ব্যাপারটা যদি সত্যিই তাই হয়, তবে সেই দারুণ থ্রিলিং ব্যাপারটা আমিই প্রথম ছোটকাকে ধরিয়ে দিয়েছি। মনে-মনে কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও সঙ্গে-সঙ্গে সতর্কও হয়ে উঠলাম। ডাকাতরা নাকি খুব বেপরোয়া হয়। দরকার পড়লে আরও দু'চারটে খুনখারাপি করা ওদের কাছে জলভাতের মতো ব্যাপার। আমি নীলশার্টের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বললাম, "কিন্তু ডাকাতটার কাছে নিশ্চয়ই রিভলভার আছে। বেকায়দা দেখলে সোজা চালিয়ে দেবে।"

ছোটকা লালগেঞ্জির দিকে তাকিয়ে বলল, "সাদা পোশাকে থাকলেও পুলিশ কখনও বিনা অস্ত্রে থাকে না। আর জানবি, ভয় পেলে কক্ষনো ভাল কাজ হয় না। ক্রিমিন্যালদের ধরার ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।"

আমি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। নীলশার্ট তখন কাগজটা একটু সরিয়ে নিয়ে লালগেঞ্জিকে দেখছিল। ওর চুরি করে দেখার ভঙ্গিটাই ওকে আরও বেশি সন্দেহভাজন করে তুলল। একটু দেখেই লোকটা আবার কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলল। আমি লালগেঞ্জির দিকে তাকালাম। তাকিয়েই চমকে উঠলাম। দেখলাম সে চিন্তিত মুখে নীলশার্টের কাগজ-পড়া দেখছে। মনে হল সে কিছু সন্দেহ করছে। আমি উত্তেজিতভাবে ছোটকাকে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিলাম। কিন্তু বুঝলাম ছোটকাও সবদিকে নজর রেখেছে। নিচুগলায় বলল, "লোকটা পরের স্টপেই পালাবে। তার আগেই তাকে ধরতে হবে।"

বলেই ছোটকা উঠে দাঁড়াল। সামনের সিটের কাছে গিয়ে কিছু বলবে বলে নীলশার্টের দিকে তাকাল। সে কী, ছোটকা এক্ষুনি লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করে বসবে নাকি! আমি দমবন্ধ করে অপেক্ষা করে থাকলাম। বাসভর্তি এত লোক, কিন্তু কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না যে বাসের মধ্যে কী এক রোমহর্ষক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে।

কিন্তু ছোটকা সেসব কিছু করল না। নীলশার্টের দিকে হাত বাড়িয়ে খুব ভদ্রভাবে বলল, "কাগজটা দেবেন একটু?"

নীলশার্ট ছোটকাকে দেখে কেমন যেন বিস্মিত মুখ করল। কিছু না-বলে কাগজটা এগিয়ে দিল ছোটকার দিকে। ছোটকা কাগজ নিয়ে এসে আবার আমার পাশে বসল।

কাগজ চাইবার নামে ছোটকা যে লোকটার মুখ ভাল করে দেখে নিল, সেটা আমি ভাল করেই জানি। তবু ছোটকার মতো বুদ্ধিমান লোক কেন যে বোকার মতো এমন কাজ করল বুঝতে পারলাম না। অপরাধীর মন নাকি সব সময়েই সন্দেহপ্রবণ থাকে। ছোটকার হাবভাবে সে নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে যাবে। এতে পুলিশের কাজেরও অসুবিধে হয়ে যেতে পারে। গোয়েন্দাগিরির প্রথম সুযোগ পেয়ে অতিমাত্রায় উৎসাহে ছোটকা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

একটু পরে ছোটকা বলল, "ব্যাপারটা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে এলাম। তবে ডাকাতটা পালাতে পারবে না।"

ছোটকা যে সত্যিই বোকার মতো কিছু করেনি একটু পরেই তা টের পেলাম। বাসটা তখন কোনো স্টপের খুব কাছে চলে এসেছে, কেউ কেউ নামবে বলে তৈরি হচ্ছে। নীলশার্টকেও দেখলাম উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখামাত্র ছোটকাও লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। আমাকে বলল, "চুপ করে বসে থাকবি। সিট ছেড়ে একটুও উঠবি না।" বলে ছোটকা দ্রুত দরজার কাছে চলে গেল। টানটান রোমাঞ্চ আর উত্তেজনায় আমি সোজা হয়ে বসে থাকলাম। নীলশার্ট নামতে গেলেই ছোটকা তাকে

ধরে ফেলবে। আর লালগেঞ্জি তো আছেই। তাকেও দেখলাম দরজার খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে। এক্ষুনি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে।

হলও তাই। গাড়ি যেই থামল, নীলশার্টও অমনি লোকজনকে ঠেলেঠুলে দরজার কাছে চলে আসতে থাকল, আর ছোটকাও ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে চেপে ধরল। কিন্তু এ কী, এ কী, ছোটকা তো জাপটে ধরেছে লালগেঞ্জিকে, নীলশার্টকে তো নয়, ডাকাত তবে কে ?

লালগেঞ্জি ঝটকা মেরে ছোটকার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ততক্ষণে নীলশার্টের হাতে রিভলভার উঠে এসেছে। কঠিন গলায় নীলশার্ট বলল, "অনু চৌধুরী, পালাবার চেষ্টা করলেই কিন্তু গুলি চালাতে বাধ্য হব। প্রাণের মায়া থাকলে সারেণ্ডার করো। আমাদের সোর্সের খবর অনুযায়ী স্বর্ণময়ী জুয়েলারির খুন আর ডাকাতির কেসে দলের পাণ্ডা তোমাকেই আমরা খুঁজছিলাম।" বলেই এগিয়ে এসে লালগেঞ্জির পাকানো গোঁফ ধরে টান মারল। আর সঙ্গে সঙ্গে নকল গোঁফটা নীলশার্টের হাতে চলে এল।

গাড়িসুদ্ধ লোক তখন ভয়ানক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ডাকাত শুনে সবাই গোল করে ঘিরে ধরল লালগেঞ্জিকে। একজন বলল, "দেব নাকি গণধোলাই ?"

নীলশার্ট বলল, "না। আইন পুলিশের হাতেই থাকা ভাল। তবে আপনারা দয়া করে একটু অ্যালার্ট থাকবেন যাতে বদমাসটা পালাবার চেষ্টা না করে।" তারপর ছোটকার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রসেনজিৎবাবু। আপনি না থাকলে একে ধরা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ত।"

ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছিলাম, কিন্তু ঘটনার চরিত্রগুলো অদলবদল হয়ে গিয়েছিল। নীলশার্ট হয়ে গেল পুলিশের অফিসার আর লালগেঞ্জি হয়ে গেল ডাকাত। পরে জিজ্ঞেস করাতে ছোটকা জ্ঞানীর মতো মুখ করে বলেছিল, "বুঝলি বোকারাম, একেই বলে বিশ্লেষণী ক্ষমতা আর পর্যবেক্ষণ শক্তি। পুলিশ অফিসার মিস্টার শর্মার সঙ্গে আমার পরিচয় না-ও যদি থাকত, তা হলেও কে ডাকাত আর কে পুলিশ বুঝতে মোটেই সময় লাগত না। মিস্টার শর্মাকে কাগজ নেবার সময় চোখ টিপে জানিয়েছিলাম আমিও আছি। যেখানে পাঁচদিন আগে অতবড় ডাকাতি হয়ে গেছে, পুলিশের জোর তৎপরতা চলছে, সেই শিলিগুড়ি থেকে এরকম প্রকাশ্যে আসবে, কোনো ক্রিমিনাল এত বড় বুদ্ধু হবে এটা ভাবা একটু কঠিন। তাছাড়া একটা অল্পবয়েসি লোকের ওরকম বেমানান গোঁফ, ভিড়ের ফাঁক দিয়ে চুপিচুপি তাকানো, মাঝরাস্তা থেকে শেষবিকেলে বাসে উঠে লোকজনের মধ্যে মিশে থাকা—সবকিছুই অপরাধীকে চিনিয়ে দিয়েছিল। আর মিস্টার শর্মা যে এই কেসের তদন্ত করছেন, সেটা আগেই শুনেছিলাম। তবে তোর দোষ নেই। সবার আই-কিউ তো সমান হয় না। অনু চৌধুরীর দুর্ভাগ্য যে, সে যে বাসে উঠেছিল, সেই বাসের স্বয়ং প্রসেনজিৎ সোম ফিরছিল।"

ছোটকার গা-জ্বালানো মুচকি-মুচকি হাসিতে আমার রাগ হয়ে গেলেও চুপ করেই থাকতে হল। সত্যিই তো ছোটকা একটা কাজের মতো কাজ করেছে।

ছবি : বিমল দাস

# জেনে নাও

## খেয়ে উঠলেই ঘুম পায় কেন ?

*ভরা পেটে খেয়ে ওঠার পরে দেখা যায়, বড্ড বেশি ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে আসে, ঘুম-ঘুম ভাব, মনে হয় একটু যেন গড়িয়ে নিতে পারলে ভাল হয়।*

*দিনের বেলায় যেদিন স্কুল, কলেজ, আফিস, কাছারি থাকে, সেদিন আর দিনে ঘুম হয় না। কিন্তু ছুটির দিনে বা রোজ রাত্তিরে খাওয়ার পরে এটা ভালভাবে টের পাওয়া যায়। তাছাড়া রাতের খাওয়াটা হয় দিনের খাওয়ার চেয়ে আরও ভালভাবে। তখন তো আর ব্যস্ততার কারণ থাকে না। ফলে খেয়ে উঠলেই যে ঘুম পায় রাতের বেলায়, সেটা টের পাওয়া যায় আরও পরিষ্কার। অথচ খেয়ে ওঠার পরে কিছুটা সময় গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দিতে পারলে দেখা যায়, ঘুমটা কেটে গেল। ইচ্ছে করলে যে-কেউ তখন বই নিয়ে বসতে পারে।*

*কিন্তু খেয়ে উঠলেই ঘুম পায় কেন ? খাওয়ার সঙ্গে কি ঘুমের কোনো সম্পর্ক আছে।*

*হ্যাঁ, আছে। খাওয়ার পরে শরীরের মোট রক্তের একটা বড় অংশ অন্ত্রে চলে আসে। এটা আসে হজমে সাহায্য করবার জন্যে। আবার এই রক্তের ভেতর দিয়েই অক্সিজেন বয়ে চলে। তাহলে রক্তের অনেকটা অংশ অন্ত্রে চলে এলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব ঘটে যায়, আর মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাবের ফলে অবসন্নতা এবং ঘুমের ভাব। একে বলা হয়* **temporal cerebral anoxia**।

*এই অভাবটা অবশ্য সাময়িক। সেই কারণে খানিকক্ষণ বাদে ঘুম-ঘুম ভাব কেটে গিয়ে শরীর আবার সতেজ আর চাঙ্গা হয়ে ওঠে।*

## পিঁপড়ে কামড়ালে জ্বালা করে কেন ?

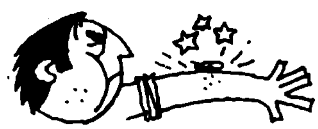

*পিঁপড়েরা যখন কামড় দেয়, তখন অবাক হয়ে যেতে হয়। কী জ্বালা ! কী জ্বালা ! ছোট পিঁপড়ে, অথচ এত জ্বালা নিয়ে আসে কোথা থেকে ? কাটা আঙুলে ওষুধ দিলেও তো এত কষ্ট হয় না। তাহলে পিঁপড়ের কামড়ে নিশ্চয় কোনো বিষ আছে।*

*কামড়ের ভেতর দিয়ে কোন্ বিষ সে ঢেলে দিচ্ছে আমাদের শরীরের মধ্যে ?*

*কামড় দিয়ে যে জ্বালা-ধরানো রাসায়নিক পদার্থটি পিঁপড়ে পাঠায় আমাদের শরীরে, তার নাম ফরমিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডটি কিন্তু উদ্বায়ী। হাওয়ার সংস্পর্শে রাখলে উবে যায়। সেই সঙ্গে এর গন্ধটাও উগ্র। চামড়ার উপরে লাগলে জ্বালা করে। ভেতরে গেলে তো কথাই নেই।*

*সদা-ব্যস্ত পিঁপড়েরা আত্মরক্ষার জন্য যেন ফরমিক অ্যাসিডের ইনজেকশনের একটা সিরিঞ্জ নিয়ে সার বেঁধে কাজে চলেছে।*

*বাধা দিলেই বিপত্তি।*

অরূপরতন ভট্টাচার্য

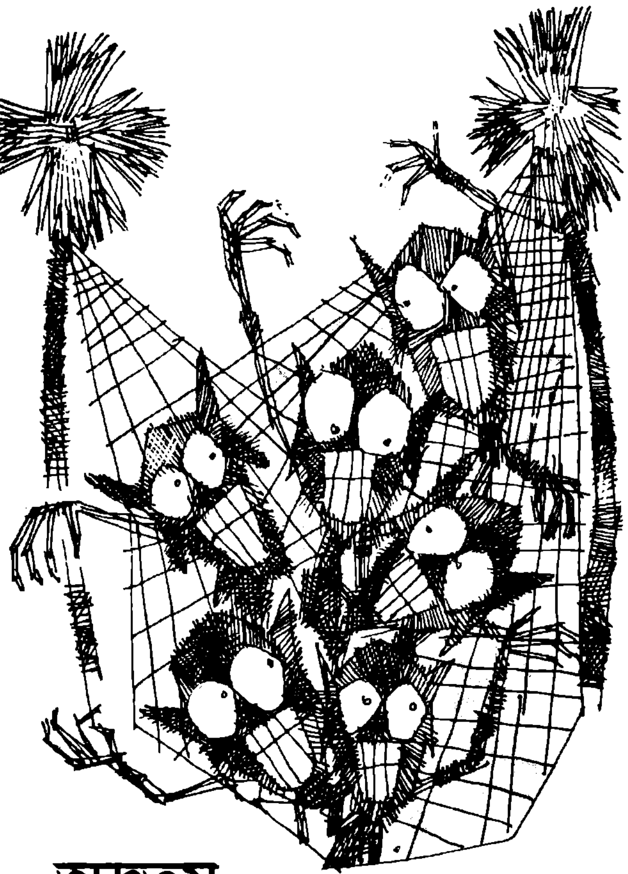

# অদ্ভুতুম

রত্নেশ্বর হাজরা

ঠিক দুপুরে মাঝপুকুরে ছুঁড়ছে ঢিল,
হঠাৎ লম্বা হাত বাড়িয়ে ধরছে চিল,
মাসকাবারের জলখাবারে মারছে কাক,
বলছে কাকে, ঝলসে রাখ্।

কালকাসিন্দে ঝোপের আড়ে বৃদ্ধ ব্যাঙ
দেখতে পেয়ে চিমটি দিয়ে ধরল ঠ্যাং।
হঠাৎ কিসের খেয়াল হতেই—দুইটি তাল
গাছের মাথায় চওড়া করে বাঁধল জাল—
এবার জালে আটকে মরুক কয়েক শো
পাখনা-ছাড়া ভূতের পো।

ডানপিটে সব ভূতের খোকা আটকিয়ে
পড়বে শুয়ে বিকট নাকে তেল দিয়ে।
যখন-তখন ভূতগুলো সব শ্যাওড়াগাছ
তোলপাড়িয়ে ঘুম ভাঙিয়ে করত নাচ—
এবার থাকবে জালের সাথে লটকানো।

অদ্ভুতুম জলখাবার খাবে, ঝলসানো
কাকের সাথে স্যালাড করে তিনটে চিল।
সেই খুশিতেই মাঝপুকুরে ছুঁড়ছে ঢিল।

# পোষা মশা

সুজিত সরকার

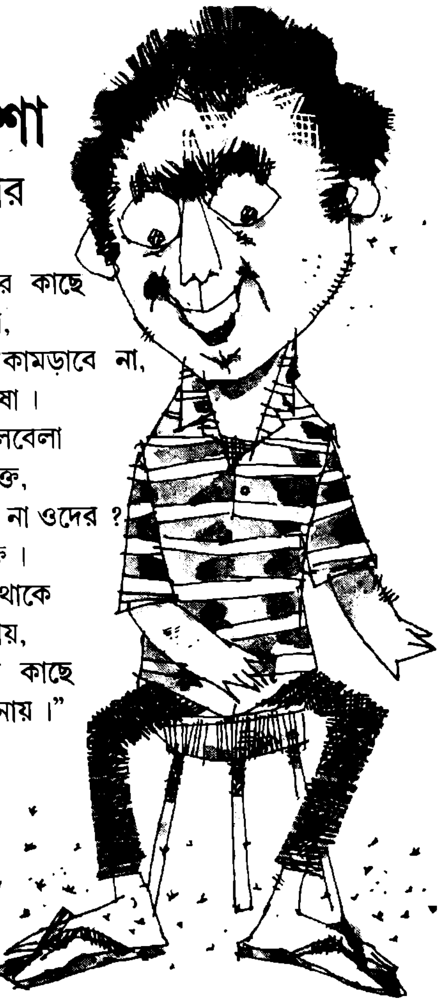

বিপিনবাবুর পায়ের কাছে
উড়ছিল খুব মশা,
হেসে বললেন, "কামড়াবে না,
ওরা আমার পোষা।
প্রত্যেকদিন সকালবেলা
দু-তিন ফোঁটা রক্ত,
নিয়ম করে দিই না ওদের?
ওরা আমার ভক্ত।
দুপুরবেলা ব্যস্ত থাকে
আলাপ-আলোচনায়,
সন্ধেবেলা কানের কাছে
রাগ-সংগীত শোনায়।"

# চিন্তার কথা

জয়া মিত্র

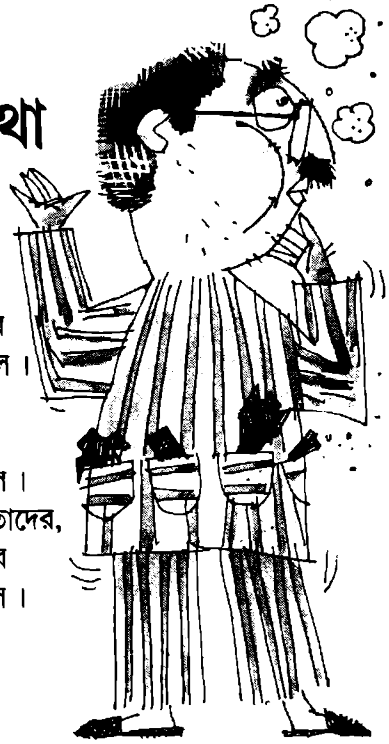

বনমালী বসাকের
ঘুমোবার পোশাকের
বারোটা পকেট ছিল।
সেইসব পকেটে
চারখানা রকেটের
পা এবং পেট ছিল।
মাথা কোথা যে তাদের,
এই ভেবে বসাকের
নিজমাথা হেঁট ছিল।

ছবি : দেবাশিস দেব

# কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

*আগে যা ঘটেছে :* দিপু আর তার দিদি ইরানি বর্ধমানের এক গ্রামে এসেছে তাদের জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ নিতে। জ্যাঠামশাই রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে নানারকম ফলের বাগান করেছিলেন। কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই মাঝরাতে লেবুবাগানে এসেছিলেন, তার পর থেকেই তিনি উধাও। দিপু আর ইরানি এসে দেখল, লেবুবাগানের কয়েকটা গাছ কে যেন উপড়ে ফেলেছে। লেবুবাগানটা বেশ বড়, ভেতরটা অন্ধকার। দিপু একা ঢুকে পড়ল সেই বাগানের মধ্যে। তারপর ...

দিপু গুঁড়ি মেরে মেরে এগোতে লাগল সামনের দিকে। প্রথমে যতটা অন্ধকার মনে হয়েছিল, বাগানের ভেতরটা তত অন্ধকার নয়। আবছামতন, এক-এক জায়গায় রোদ্দুর এসে পড়েছে বর্শার ফলকের মতন। মাঝে-মাঝে কাঁটার খোঁচা লাগছে দিপুর পিঠে।

দূর থেকে ইরানি ডাকল, "এই দিপু, বেশি দূর যাসনি ! এবারে চলে আয়।"

দিপু উত্তর দিল না।

সে দেখতে পেল, এখানেও এক জায়গায় দুটো গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে। গাছ দুটো অন্য গাছের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে, দুটোর গোড়াতেই বেশ বড় গর্ত। কেউ শাবল দিয়ে খুঁড়েছে।

দিপু বুঝতে পারল না, এই ভাবে লেবুগাছগুলোকে মেরে ফেলে কার কী লাভ।

তারপরই সে দারুণ চমকে উঠল। চিৎকার করে বলল, "দিদি, দিদি ! কেষ্টদাকে একবার শিগগির এখানে পাঠিয়ে দে !"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ? কী দেখলি ওখানে ?"

দিপু বলল, "জ্যাঠামশাই !"

সামনেই আর-একটা জায়গায় চার-পাঁচটা গাছ উপড়ে কিছুটা জায়গা ফাঁকা করা হয়েছে। সেইখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের দেহ। ধুতি পরা, খালি গা।

দিপুর বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছে। তিন দিন ধরে জ্যাঠামশাই পড়ে আছেন এখানে। বেঁচে আছেন না মরে গেছেন ? দিপু ছুঁতে সাহস পাচ্ছে না।

সে আস্তে-আস্তে ডাকল, "জ্যাঠামশাই ! জ্যাঠামশাই !"

প্রথমে ছুটে চলে এল রঘু। দিপুর পাশে পৌঁছে বলল, "ওমা, কী হয়েছে ? মেরে ফেলেছে ?"

দিপু রঘুকে বাধা দিয়ে বলল, "বেশি কাছে যাবি না। আগে পুলিশ এসে দেখবে। দ্যাখ্ তো, এখানে কারুর পায়ের দাগ আছে কি না !"

কেষ্ট অন্য একটা দিক দিয়ে ঘুরে এসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল বাগানের মধ্যে। দিপুকে প্রথমটায় দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গো, দিপুবাবু, কোথায় তুমি ? কী হয়েছে ?"

দিপু বলল, "এই যে, এদিকে আসুন !"

কেষ্ট কাছে আসবার পর দিপু বলল, "আপনারা বাগানটা ভাল করে খুঁজেও দেখেননি ? তিন দিন ধরে উনি এখানে পড়ে আছেন।"

কেষ্টর ভুরু কুঁচকে গেল। তারপর বলল, "এ কে ?"

কেষ্ট এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই দিপু বলল, "এখন ছোঁবেন না। আগে পুলিশ আসুক।"

কেষ্ট বলল, "এ তো বড়বাবু নয় !"

রঘু বলল, "ও দাদাবাবু, লোকটা বেঁচে আছে। নিশ্বাস ফেলছে।"

কেষ্ট ধমক দিয়ে বলল, "অ্যাই ! তুই কে রে ?"

এবারে লোকটি মুখ ফেরাল। জায়গাটায় আলো কম বলে দিপু আগে বুঝতে পারেনি। লোকটির মুখভর্তি দাড়ি, মাথার চুলও জট-পাকানো।

লোকটি বলল, "আঃ, বড্ড জ্বালাতন করো। কোথাও একটু নিশ্চিন্দে ঘুমুবার জো নেই !"

কেষ্ট বলল, "যাচ্চলে ! এ তো পাগলা মুরশেদ ! এই ব্যাটা, তুই এখানে কী করছিস ?"

দিপু একেবারে হতবাক। সে যেন ধরেই নিয়েছিল যে, সে জ্যাঠামশাইয়ের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে। কষ্ট হবার বদলে তার উত্তেজনা হচ্ছিল অনেক বেশি, কেননা এতবড় একটা কৃতিত্ব তার একার। কিন্তু, তার বদলে একটা পাগল !

কাঁটার ভয় দমন করে ইরানিও চলে এসেছে ভেতরে। অনেকখানি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, "এ কী, এখানে একজন লোক রয়েছে ? এ কে ?"

কেষ্ট বলল, "ও একটা পাগল !"

দাড়িওয়ালা লোকটি মুখ ভেংচিয়ে বলল, "আমি পাগল না তোর বাপ পাগল ! তোর চোদ্দ গুষ্ঠি পাগল !"

রঘু হিহিহিহি করে হেসে উঠল। ইরানি তার দিকে কটমট করে তাকাতেই মাঝপথে থেমে গেল সে।

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "এই লোকটি এখানে কী করছে ? এই সব গাছ ও তুলে ফেলেছে ?"

কেষ্ট জিজ্ঞেস করল, "এই মুরশেদ, তুই এতগুলো গাছ মেরেছিস কেন রে, হতভাগা ? আজ মেরে তোকে শেষ করব !"

লোকটি সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি হতভাগা না তুই হতভাগা ? আমি গাছ মারব কেন রে ? গাছকে যারা কষ্ট দেয়, তারা কি মানুষ ? তারা সব ভূত !"

তারপর সে ইরানির দিকে ফিরে বলল, "বুঝলে দিদি, এখানে এসে দেখলুম, কতকগুলোন তাজা-তাজা গাছ ভুঁয়ে পড়ে আছে। তাই দেখে বড় কষ্ট হল। একটুখানি কাঁদলুম বসে-বসে। তারপর কখন জানি ঘুম এসে গেল !"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "আপনি এই লেবুবাগানের মধ্যে

এসেছিলেন কেন ?"

লোকটি বলল, "আমি তো এখানে প্রায়ই আসি। বেশ নিরিবিলি, শান্ত জায়গা। ঘুমিয়ে আরাম। কেউ ডিসটার্ব করে না।"

দিপু চমকে উঠল। লোকটি ইংরিজি জানে ? চেহারা দেখলে বিশ্বাস হয় না। মনে হয় সাধারণ চাষাভুষো।

কেষ্ট ধমক দিয়ে বলল, "ব্যাটা, এটা তোর ঘুমুবার জায়গা ? এত দামি দামি সব গাছ !"

লোকটি বলল, "বেশ করব ! আমার যেখানে ইচ্ছে ঘুমুব। বড়বাবুর সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল। বড়বাবু বলেছিলেন, তা বেশ বেশ, তোর ইচ্ছে হয় তো ঘুমুবি এখানে। লেবুপাতার বাতাস লাগলে শরীল ভাল হয়। বড়বাবু আমাকে পারমিশান দিয়েছেন !"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "এই সব গাছ কে নষ্ট করছে, আপনি জানেন ?"

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। ঐ ওরা।"

সে পেছন দিকে বুড়ো আঙুল দেখাল।

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "ওরা মানে কারা ?"

"সে তোমরা বুঝবে না, দিদি। তাদের চেনা বড় মুশকিল !"

"তারা কি এই গ্রামেরই লোক ?"

"কী যে বলো, তারা এই গ্রামের হতে যাবে কেন ? তারা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, তা কেউ জানে না ! তবে আমার চোখকে ওরা ফাঁকি দিতে পারে না। আমি সব বুঝি ! হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ !"

কেষ্ট নিজের মাথার চারপাশে একটা আঙুল ঘুরিয়ে বোঝাল যে, লোকটির মাথা একেবারে খারাপ।

লোকটি হঠাৎ মাথা নিচু করে এক দৌড় লাগাল।

কেষ্ট বলল, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই যে গাছগুলোকে সব উপড়ে ফেলেছে, এসব ঐ পাগল মুরশেদেরই কাণ্ড ! পাগল ছাড়া এমন দামি-দামি গাছ কে নষ্ট করবে বলুন ?"

দিপু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবারে সে বলল, "গাছের গোড়াগুলো অনেকখানি করে খোঁড়া হয়েছে। ওর কাছে শাবল-টাবল তো কিছু ছিল না !"

কেষ্ট বলল, "এখানে কোথাও শাবল লুকিয়ে রেখেছে হয়তো ! তা ছাড়া, ওর হাতের নোখ লক্ষ করেছেন, কত বড় ?"

ইরানি বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, চল্, বাইরে যাই।"

ওরা লেবুবাগান থেকে বেরিয়ে আসবার পর ইরানি বলল, "এইরকমভাবে বাগানে যখন-তখন লোক ঢুকে আসতে পারে ? তা হলে তো সব লেবু চুরি হয়ে যেতে পারে !"

কেষ্ট বলল, "এমনিতে তো এদিকে কেউ চুরি-টুরি করতে আসে না। গাছে যখন লেবু ছিল তখন অবশ্য রাতে আমরা পাহারা দিয়েছি। কিন্তু পাগলকে কী করে আটকানো যায় বলুন। ও মাঝে-মাঝেই আসে। বড়বাবু ওকে পছন্দ করতেন। ঐ মুরশেদ এখানকার প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার ছিল। তারপর হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। একেবারে যা-তা পাগল। ও নাকি দিন-দুপুরে ভূত দেখতে পায়, ভূতের সঙ্গে কথা বলে !"

ইরানি বলল, "আচ্ছা, ওর সম্পর্কে পরে শুনব। এখন তো

একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয় !"

দিপু বলল, "তা হলে আজকের রাত্তিরটা এখানেই থেকে যাব তো ?"

ইরানি বলল, "শুধু আজকের রাত্তির কেন ? আমরা জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ নিতে এসেছি । খোঁজ না নিয়ে ফিরব কী করে ?"

দিপু বলল, "তা হলে এক কাজ করা যাক । টেলিগ্রামে তো সব কথা লেখা যাবে না । বরং আমরা রঘুকে ফেরত পাঠিয়ে দিই । ও গিয়ে মাকে সব খুলে বলতে পারবে । তুই একা-একা যেতে পারবি না, রঘু ?"

রঘু মুখ গোঁজ করে বলল, "না, আমি যাব না !"

ইরানি হুকুমের সুরে বলল, "হ্যাঁ, তোকে যেতে হবে । দিপু ঠিকই বলেছে ।"

রঘু বলল, "আমি একা গেলে হারিয়ে যাব !"

দিপু বলল, "অমনি চালাকি হচ্ছে ? তুই যে বলেছিলি, তুই তোর দেশের বাড়িতে একা-একা যেতে পারিস ট্রেনে চেপে ?"

রঘু বলল, "সে তো অন্য লাইন !"

ইরানি কেষ্টকে বলল, "রান্না হয়েছে কি না দেখুন তো ! রঘুকে আগে খাইয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে ।"

রান্না তৈরি, সকলেই একসঙ্গে খেতে বসে গেল । গরম-গরম খিচুড়ি আর বেগুনভাজা আর ডিমের ঝোল । এককড়ি রাঁধে বেশ ভাল, কিন্তু মুখটা গোমড়া । দিপু আর ইরানির এখানে থেকে যাওয়া যেন তার পছন্দ নয় । একবার সে বলেই ফেলল, "বড়বাবু নেই, তোমরা ছেলেমানুষ এখানে থাকবে, আবার যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয় !"

ইরানি বলল, "আপনি যত ছেলেমানুষ ভাবছেন, আমরা তত ছেলেমানুষ নই ।"

এককড়ি ঠাকুর অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "হুঁঃ !"

খাওয়া-দাওয়া চুকে যাওয়ার পর রঘুর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে, বুঝিয়েসুঝিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতার দিকে । তারপর ইরানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল কেষ্ট আর এককড়িকে ।

দিপুর মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে । তার মাথাটা কেমন যেন ভোঁতা-ভোঁতা লাগছে, কিছুতেই বুদ্ধি খুলছে না । ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে না কিছুই । জ্যাঠামশাই হঠাৎ কোথায় চলে যেতে পারেন ? লেবুবাগানে পাগলটিকে দেখে দিপুর অতখানি ভুল হল কেন ? লোকটি কি সত্যিই পাগল ? কথা শুনে তো পাগলামির কোনো লক্ষণ বোঝা গেল না ?

বারান্দায় বসে দিপু একদৃষ্টে চেয়ে রইল আধ-ঝলসানো পেয়ারাবাগানটার দিকে । এরকম তাকিয়ে থাকতে থাকতে দিপু হঠাৎ কোনো দৃশ্য দেখতে পায়, যা অন্য কেউ দেখে না । কিন্তু এখন সে-রকম কিছুই হচ্ছে না ।

আস্তে-আস্তে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এল । তারপরই অসংখ্য ঝুমঝুমির মতন শোনা যেতে লাগল ঝিঁঝির ডাক । কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই বলে চারদিকে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার ।

এক সময় ইরানি এসে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, তুই এমন চুপ করে বসে আছিস ? কী ভাবছিস ?"

দিপু বলল, "ভাবছি, কাকাবাবুকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয় ?"

ইরানি অবাক হয়ে বলল, "কাকাবাবু ? কাকাবাবু আবার কে ? আমাদের তো কোনো কাকা নেই ।"

দিপু বলল, "ধুত ! সে-কথা বলছি না । বলছি, সন্তুর কাকাবাবুর কথা । উনি কত কঠিন-কঠিন সব রহস্যের সমাধান করেছেন । কাকাবাবুকে যদি সব কথা জানিয়ে চিঠি লেখা যায়, তা হলে উনি এখানে আসবেন না ?" (ক্রমশ)

# ইতিহাসের গল্প

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

## 'ধ' চ 'ম' কওন কেলা ?

১৭৬১ সালের ১৪ই জানুয়ারি বিকেল । পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল । আহমদ শাহ আবদালি জিতলেন, মারাঠাদের সর্বনাশ হল । তৃতীয় পেশোয়া বালাজি বাজি রাওয়ের শরীর খারাপ । তিনি যুদ্ধে যাননি, পুনায় ছিলেন । মারাঠিরা বলেন 'পুনে' । কয়েকদিন পরে তাঁর কাছে যুদ্ধের চিঠি নিয়ে খবর এল । সে-চিঠি সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা । "দুটি মুক্তো গলে গিয়েছে, বাইশটি মোহর হারিয়েছে । রুপো ও তামা যে কত গিয়েছে, তার হিসেব নেই ।" দুটি মুক্তো মানে পেশোয়ার বড় ছেলে বিশ্বাস রাও, যিনি বেঁচে থাকলে পেশোয়া হতেন । আর-একটি মুক্তো সেনাপতি সদাশিব রাও । বাইশটি মোহর হচ্ছেন নামকরা সেনাপতিরা । এ ছাড়া পেশোয়া হারিয়েছিলেন পাঁচশো হাতি, পঞ্চাশ হাজার ঘোড়া, কয়েক হাজার উট । সবই দামি জিনিস, কিন্তু পেশোয়ার সে-কথা ভাববার অবসর ছিল না । তিনি এই বিপত্তির খবর সহ্য করতে পারলেন না, অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেলেন ।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দুজন যুবক পালিয়ে এসেছিলেন । না-এলে আরও সর্বনাশ হত । এই দুজন অনেকদিন পর্যন্ত বিদেশীদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন ; শত্রু ছিল দেশবাসীদের মধ্যেও । তাদেরও তাঁরা ঠেকান । এই দু'জনের একজনের নাম নানা ফাড়নবিস, তিনি যোদ্ধা ছিলেন না, দপ্তরে কাজ করতেন । পরে মারাঠা রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন । আর-একজনের নাম মহাদজি সিন্ধিয়া । তিনি গোয়ালিয়রের লোক । ইংরেজরাও পরে এই দুজনকে সমীহ করে চলত ।

পেশোয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় ছেলে মাধব রাও

# শুধুমাত্র জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার-ই তার নিজস্ব অনন্য ৩-মুখী ক্রিয়া দ্বারা ঘামাচি হওয়া রোধ করে ও তার মোকাবিলা করে

কেবলমাত্র জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারে আছে এক প্রমাণিত ঔষধিযুক্ত ফর্মুলা, যেটি ৩টি কার্য্যকরী উপায়ে কাজ করে :

- **রোধ**
এর ব্যাকটিরিওস্ট্যাটিক ক্রিয়া ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার প্রসারকে রোধ করে।
- **আরাম**
মনোরম সুবাসভরা জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার আর্দ্রতা শুষে নেয় আর তাড়াতাড়ি আরাম দেয়।
- **ক্রিয়া**
জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারের এক অনন্য কেরাটোলিটিক ক্রিয়া ঘামাচিতে আক্রান্ত ত্বককে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দেয়।

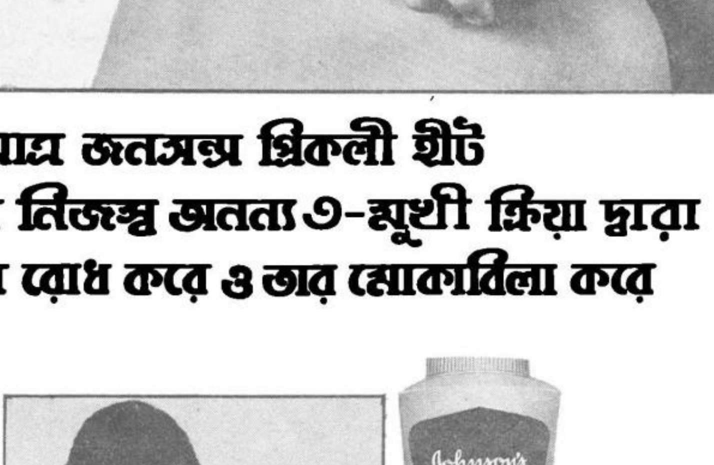


Johnson & Johnson

OBM-2615/BN

**জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার, ঘামাচির হাত থেকে আপনার সর্বোত্তম সুরক্ষা**

পেশোয়া হলেন। দশ বছর তিনি পেশোয়া ছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন, মহারাষ্ট্রে যত পেশোয়া হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। বেঁচে থাকলে তিনি মারাঠা রাজ্যগুলিকে হয়তো এক করতে পারতেন। দেশের অনেক উপকার হত। কিন্তু তা হবার নয়। কয়েক বছর ধরে মাধব রাওয়ের শরীর খারাপ হচ্ছিল। ১৭৭২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যেন তাঁর ছোট ভাই নারায়ণ রাওকে পেশোয়া করা হয়।

পেশোয়া পদের জন্য আর কি কেউ দাবিদার ছিলেন না? ছিলেন বালাজি। বাজি রাওয়ের ছোট ভাই, অর্থাৎ নারায়ণ রাওয়ের কাকা রঘুনাথ রাও। পেশোয়ার আসনের উপরে তাঁর দারুণ লোভ ছিল। এমন খারাপ কাজ নেই, পেশোয়া হবার জন্য যা তিনি করতে পারতেন না। কিছুদিন তাঁকে বন্দী করেও রাখা হয়েছিল। আস্তে আস্তে তাঁর বন্দী-দশা শিথিল হয়ে এল। পানিপথের যুদ্ধ যখন হচ্ছে, তখন নারায়ণ রাও যে প্রাসাদে থাকতেন সেই প্রাসাদে তাঁরও থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর ফল ভাল হয়নি।

নতুন পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের বয়স বেশি নয়, মাত্র সতেরো বছর। কিন্তু সেই সময় সতেরো বছরকে খুব কম বয়স ভাবা হত না। অল্প বয়সে কেউ কেউ রাজ্যও চালিয়েছেন ভাল করে। তাঁদের মন্ত্রীরা অবশ্য খুব দক্ষ ছিলেন। তখন পুনেতে যিনি প্রায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন, রাজ্য চালাবার ক্ষমতা সেই নানা ফাড়নবিসেরও ছিল অসামান্য। নারায়ণ রাও নিজে কিন্তু খুব চৌকস পেশোয়া ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর মন সতেরো বছরের তরুণের মতো গড়ে ওঠেনি, তার চেয়ে অনেক কম বয়সের ছেলের মতো ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলেকে কিছু সংস্কৃত জানতেই হত। তিনি অন্য লেখাপড়াও কিছু-কিছু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহার ঠিক পেশোয়া বংশের ছেলের মতো ছিল না। হাসি-তামাশা কিছু দোষের নয়, যদি মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের সে-কথা বুঝবার ক্ষমতা নারায়ণ রাওয়ের ছিল না।

পুনে নগরে পেশোয়াদের কয়েকটি প্রাসাদ ছিল। বাড়ির নাম সপ্তাহের একটি দিনের নামে রাখা হত। পেশোয়া ও তাঁর কাকা যে বাড়িতে থাকতেন, তার নাম শন্‌বারওয়াড়া। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে দাঁড়াবে স্যাটারডে প্যালেস। সেইরকম আর-একটি প্রাসাদের নাম বুধবারওয়াড়া। শন্‌বারওয়াড়াই সবচেয়ে বড় প্রাসাদ। কিন্তু দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে এসব প্রাসাদ চোখে লাগবে না।

বাড়িটি দোতলা। উপরে উঠবার সিঁড়ি খুব সংকীর্ণ। পাছে আক্রমণ হয়, সেই ভয়ে এই সতর্কতা। সরু সিঁড়িতে অল্পলোকই বেশি লোককে ঠেকাতে পারত। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বারান্দা, সেও প্রশস্ত নয়। বারান্দার পাশে সারি-সারি থাকবার ঘর। বারান্দা থেকে দু'এক ধাপ উঠে ঘরে ঢুকতে হয়। এই বাড়ির দোতলায় ১৭৭৩ সালের ৩০ অগস্ট তারিখে দুপুরবেলা এক বিষম কাণ্ড ঘটে গেল।

অনেকদিন থেকে পেশোয়ার সৈন্যদলে গর্দি বলে এক বিশেষ শ্রেণী থাকত। আরব, খ্রিস্টান সব সম্প্রদায়ের লোকই এতে যোগ দিত। শিবাজির সময়েও তাঁর সৈন্যদের মধ্যে কিছু

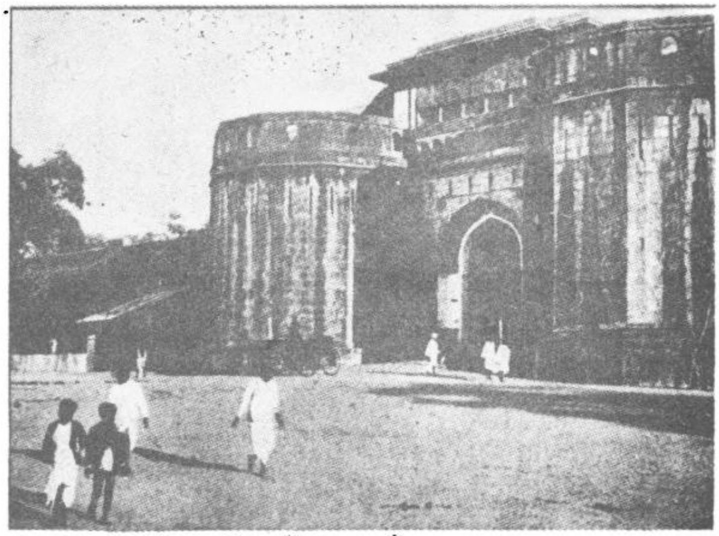

*শনবারওয়াড়া। পুনের এই দুর্গেই খুন হয়েছিলেন পেশোয়া নারায়ণ রাও*

বিদেশী লোক রাখা হত। সমুদ্রে জাহাজ চালাতে, কামান বন্দুক ছুঁড়তে এদের জুড়ি ছিল না। এদের মাইনেও সাধারণ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদের চেয়ে কিছু বেশি হত। মাইনে বেশি হলে কী হবে, সে-টাকা নিয়মমত তারা পেত না। পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের আগে থেকেই তাদের মাইনে অনেক বাকি পড়েছিল। নারায়ণ রাওয়ের আগে যিনি পেশোয়া ছিলেন সেই মাধব রাও তো রাজ্য শাসনের খরচ মেটাতে গিয়ে প্রায় ফতুর হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশী সৈন্যরা ভাল যুদ্ধ করত বটে কিন্তু তাদের এ-দেশের প্রতি কোনো মমতা থাকবার কথা নয়। এ অবস্থা যে শুধু আমাদের দেশেই ছিল, তা নয়, ইউরোপের অনেক দেশে আগে এ রকম দল ছিল। গর্দিরা বাকি টাকার জন্য মাঝে মাঝে গোলমাল করছিল, কিন্তু সে তো অনেক সময়েই হয়। রাজ্যের কত সমস্যা থাকে। সব সময় সবদিকে খবরদারি করা সম্ভব হত না।

যেদিন দুপুরের কথা বলছি, সেদিন সকালবেলা রঘুজি আংরে বলে একজন নৌ-সেনাপতি পেশোয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি গুজব শুনেছিলেন যে, নারায়ণ রাওকে খুন করবার ষড়যন্ত্র চলছে। পেশোয়াকে রঘুজি বললেন, তিনি যেন সাবধানে থাকেন। এরপর পেশোয়া নারায়ণ রাও ও তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী হরিপন্থ ফাড়কে শহরের বাইরে পার্বতী মন্দিরে যান। এখন এখানে বসতি হয়েছে, সে সময় চারদিকে জঙ্গল। শুধু এখানে-ওখানে কিছু বাগান ছিল, পেশোয়ারা কখনও-কখনও বেড়াতে আসতেন। নারায়ণ রাও পার্বতীর মন্দিরে হরিপন্থ ফাড়কেকে ষড়যন্ত্রের কথা বললেন। হরিপন্থ বললেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে, তারপর ফিরে কী করা উচিত দেখবেন। দুজনের কেউই তখন বুঝতে পারেননি যে, হাতে তাঁদের সময় নেই, দুজনের আর দেখা হবে না।

তখন বেলা আন্দাজ একটা। পেশোয়ার তখন দুপুরের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমন সময় নীচ থেকে শোরগোল শোনা গেল। একদল গর্দি পিছনের দরজা দিয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে। তারা সংখ্যায় বেশ ভারী, পাঁচশোর মতো হবে। যে অল্প কয়েকজন প্রহরী ও দপ্তরের

"ওফ ! ঠেকে শিখেছি,
সস্তা পাউডার আর নয়।
আমার বাবা ন্যাটই ভাল।"

একটু খরচ বাঁচাতে গিয়ে কাপড় জামার কী হালই না হল! না বাবা, আর নয়। এবার বেশ ভালভাবেই বুঝেছি যে ন্যাটের কোন তুলনা হয় না।
সত্যিই ন্যাটের অনেক গুণ। খাস জার্মান পদ্ধতিতে তৈরী তাই দানাগুলি অনেক হালকা অথচ জোরালো—ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পরিমাণ পাউডার পাওয়া যায়। তাছাড়া বাজারের অন্যান্য পাউডারে যেমন "সোডা অ্যাশ" ভরা থাকে, ন্যাটে তত থাকে না। তাই কাপড় টেঁকেও বেশিদিন, আর হাতেরও ক্ষতি হয় না।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

**একটুখানি ন্যাট'এর ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়**

A Kusum Product | আস্থার সঙ্গে কিনুন

C84.7BEN

লোকজন তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, গর্দিরা তৎক্ষণাৎ তাদের মেরে ফেলল। তারপর এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখল সামনে একটা গোরু দাঁড়িয়ে। রাগের মাথায় তারা গোরুটিকেও কেটে ফেলল। গোহত্যা তখন ব্রাহ্মণ-হত্যার চেয়ে কম পাপের কাজ নয়। গর্দি ছাড়া আর কেউ হয়তো এ-কাজ করতে সাহস করত না। তারপর তারা দল বেঁধে তরোয়াল হাতে করে চেঁচাতে চেঁচাতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। অন্দরমহলে কয়েকজন ভৃত্য বাধা দিতে এসেছিল, তাদেরও প্রহরীদের দশা হল। দু-একজন দাসী গোলমাল শুনে ছুটে এসেছিল, তারাও পরিত্রাণ পেল না। নারায়ণ রাও তাঁর ঘর থেকে আঁচ পেয়েছিলেন গুরুতর কিছু ঘটছে। রঘুজি আংরের কথা হয়তো মনে পড়েছিল। তিনি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাকা রঘুনাথ রাওয়ের ঘরে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করলেন। সে-ঘর খুব কাছে। দরজা বন্ধ ছিল। 'কাকা, আমাকে বাঁচাও!' বলে তিনি দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। কেউ কেউ বলেন, রঘুনাথ রাও দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইপোর পিছনে একদল গর্দি তরোয়াল হাতে নিয়ে ছুটে আসছে দেখে দরজা ভাল করে খোলেননি। নারায়ণ রাও তাঁর দু' পা জড়িয়ে ধরেছিলেন। তিনি জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। গর্দিরা পেশোয়াকে ধরে কেটে ফেলল।

প্রাসাদে ও শহরে এত উত্তেজনা ও ভয় যে, বিকেল অবধি পেশোয়ার সৎকারের ব্যবস্থা করা গেল না। অবস্থা একটু ঠাণ্ডা হলে শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হতে লাগল। এরপর পেশোয়া কে হবেন? নারায়ণ রাওয়ের তো কোনো ছেলেপুলে নেই। থাকবার মধ্যে আছেন একমাত্র কাকা রঘুনাথ রাও, অনেক বছর ধরেই যিনি কিন্তু পেশোয়া হবার স্বপ্ন দেখছেন। কয়েকদিন পরে তাঁকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করা হল। রঘুনাথ রাওয়ের বাসনা পূর্ণ হল। কিন্তু সে যে কত অল্পদিনের জন্য তখন তা তিনি বুঝতে পারেননি।

এদিকে পুনেতে গোলমালের ফলে অন্য রাজ্যগুলির মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দিতে লাগল। রঘুনাথ রাও পুনে থেকে সৈন্য নিয়ে কুচ করে হায়দরাবাদের নিজাম আলির সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় বোঝা গেল, অনেক মারাঠা সর্দারেরই আর রঘুনাথ রাওয়ের সঙ্গে মিলে কাজ করবার ইচ্ছা নেই। পারলে যেন তাঁরা রঘুনাথ রাওকে এড়িয়ে চলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কারণ বোঝা গেল। পুনের খবর, নারায়ণ রাওয়ের স্ত্রী গঙ্গাবাঈ সন্তানসম্ভবা। অনেকের ইচ্ছা হল, সন্তান হলে তাকেই পেশোয়া করা হবে। নানা ফাড়নবিস এই দলের নেতা। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের একটা দল গড়ে তুললেন, আর নিজেদের নাম দিলেন 'বারোভাই'। তাঁদের উদ্দেশ্য নারায়ণ রাওয়ের ভাবী সন্তানের স্বার্থরক্ষা করা। তীরে এসে রঘুনাথ রাওয়ের নৌকো ডুবে যাবার উপক্রম। তিনি সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন ইংরেজদের দিকে। এই থেকেই ইংরেজদের মারাঠা যুদ্ধের সূত্রপাত।

এ পর্যন্ত সবই একরকম হল। কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের বিধবার যে পুত্রসন্তানই হবে, এ-কথা কে বলতে পারে? কন্যা জন্মালে কী হত? বারোভাই কি সেই মেয়ের পক্ষে দাঁড়াতেন? যাই হোক, ইতিমধ্যে নারায়ণ রাওয়ের বিধবা স্ত্রীকে পুরন্দর দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুরন্দর খুব সুরক্ষিত দুর্গ। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। শনবারওয়াড়ায় রঘুনাথ রাওয়ের স্ত্রী আনন্দীবাঈ স্বয়ং থাকতেন। তাঁর কাছে থাকা কি গঙ্গাবাঈ-এর পক্ষে নিরাপদ? আর একপক্ষ (তাঁরা দলে ভারী ছিলেন না) ভাবতে লাগলেন, সত্যিই যদি একটি পুত্রসন্তান না হয়ে গঙ্গাবাঈয়ের একটি মেয়ে হয়, তবে কী হবে? মেয়ের জায়গায় একটি সেই বয়সের ছেলেকে নিয়ে এসে গঙ্গাবাঈয়ের ছেলে বলে চালিয়ে দেওয়া কি অসম্ভব? শেষ পর্যন্ত অবশ্য গঙ্গাবাঈয়ের একটি ছেলেই হল। রঘুনাথ রাওয়ের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। রঘুনাথ কিংবা আনন্দীবাঈ, কেউই জোর করে বলেননি যে, ছেলেটি জাল।

অন্য একটি প্রশ্ন। দিনদুপুরে নারায়ণ রাও খুন হয়ে গেলেন, এ কি শুধু গর্দিদের কাজ। এর পিছনে কি আর কারুর হাত ছিল না? পুনের প্রধান বিচারপতি রামচন্দ্র শাস্ত্রী এ ব্যাপারে তদন্ত করেছিলেন। এ নিয়ে একটি মারাঠি গাথাও আছে। এই ঘটনাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন। দেশের বেশির ভাগ লোক বিশ্বাস করত যে, নারায়ণ রাওকে খুন করবার পিছনে রঘুনাথ রাও ও আনন্দীবাঈয়ের হাত ছিল। এক টুকরো কাগজও পরে পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, রঘুনাথ রাও হুকুম দিচ্ছেন যে 'ধরাবে'। অর্থাৎ এটা হচ্ছে পেশোয়া নারায়ণ রাওকে গ্রেপ্তার করার হুকুম। বাস্তবে কিন্তু দেখা গেল যে, কাগজটিতে কেউ একটি অক্ষর পরিবর্তন করেছে। মারাঠিতে 'ধ' অক্ষর ও 'ম' অক্ষর অনেকটা একই রকম দেখতে। সামান্য একটু পরিবর্তন করলে 'ধ'-কে সহজেই 'মা' বলে বোঝানো যায়। 'ধরাবে'র বদলে সেক্ষেত্রে পড়া হবে 'মারাবে'। অর্থাৎ 'হত্যা করো'।

ক্ষুব্ধ মহারাষ্ট্রীয়রা তখন অনেকবার প্রশ্ন করেছে, এই সাংঘাতিক কাজ কে করল? তাঁদের ভাষায়: 'ধ' চ 'ম' কওন্ কেলা? অর্থাৎ 'ধ'-কে 'ম' করল কে? এটা কি কাকিমা আনন্দীবাঈয়ের কাজ?

*ইউক্লিড ও তাঁর জ্যামিতির খ্যাতি তখন তুঙ্গে। তবে তাঁর জ্যামিতির ভাষাটা বেশ খটোমটো। তাই একদিন সম্রাটের পক্ষ থেকে ইউক্লিডকে জিজ্ঞেস করা হল, জ্যামিতি শেখার সহজ কোনো উপায় আছে কিনা। সবিনয়ে জবাব দিলেন ইউক্লিড, না মহারাজ, শিক্ষায় রাজকীয় পথ বলে কিছু নেই।*

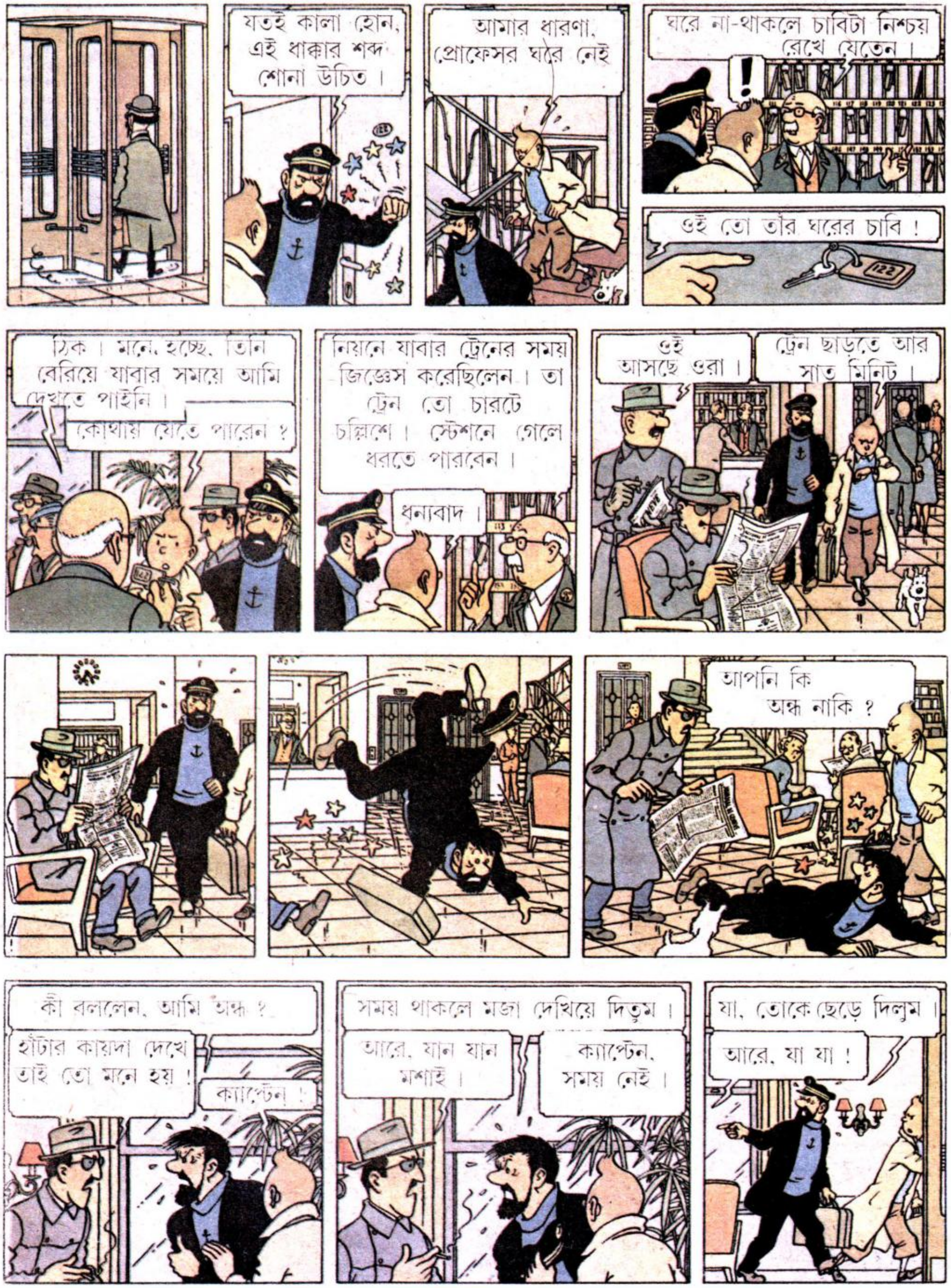
যতই কালা হোন, এই ধাক্কার শব্দ শোনা উচিত ।
আমার ধারণা, প্রোফেসর ঘরে নেই
ঘরে না-থাকলে চাবিটা নিশ্চয় রেখে যেতেন ।
!
ওই তো তাঁর ঘরের চাবি !
ঠিক । মনে হচ্ছে, তিনি বেরিয়ে যাবার সময়ে আমি দেখতে পাইনি ।
কোথায় যেতে পারেন ?
নিয়নে যাবার ট্রেনের সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন । তা ট্রেন তো চারটে চল্লিশে । স্টেশনে গেলে ধরতে পারবেন ।
ধন্যবাদ ।
ওই আসছে ওরা ।
ট্রেন ছাড়তে আর সাত মিনিট ।
আপনি কি অন্ধ নাকি ?
কী বললেন, আমি অন্ধ ?
হাঁটার কায়দা দেখে তাই তো মনে হয় !
ক্যাপ্টেন !
সময় থাকলে মজা দেখিয়ে দিতুম ।
আরে, যান যান মশাই ।
ক্যাপ্টেন, সময় নেই ।
যা, তোকে ছেড়ে দিলুম ।
আরে, যা যা !

# ক্যালকুলাসের কাণ্ড

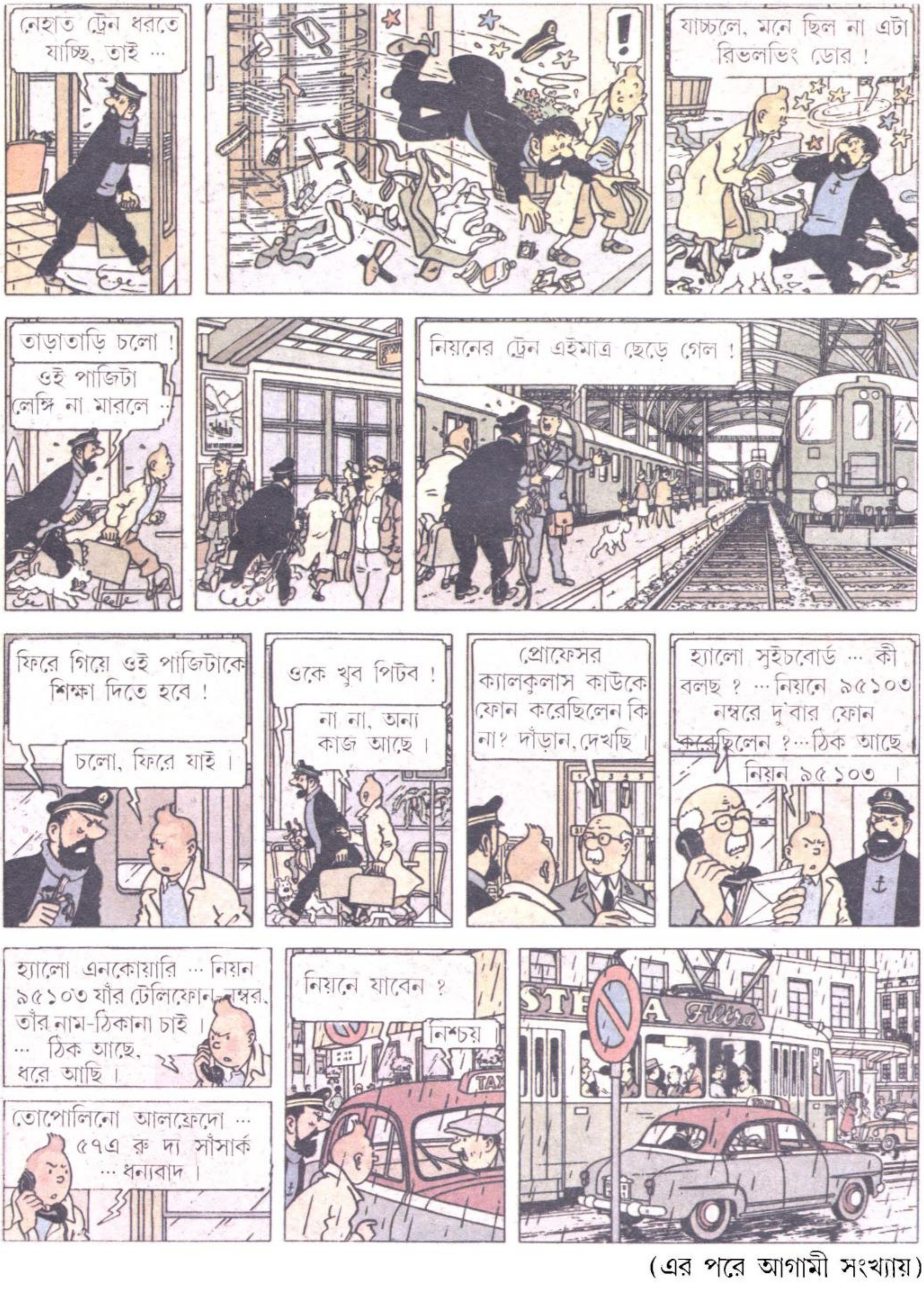


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

# উত্তরপাড়া সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অপর পারে প্রায় গঙ্গার কোল ঘেঁষেই উত্তরপাড়া সরকারি হাইস্কুলের বিশাল ভবন। উত্তরপাড়া পুরনো বর্ধিষ্ণু জনপদ। বহু বনেদি পরিবারের বসবাস এখানে। ১৮৪৮ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁরই নামে বিখ্যাত প্রাচীন উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি। রামতনু লাহিড়ী একসময়ে এই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ছিলেন।

বর্তমান প্রধানশিক্ষক শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু। শ্রীবসু একজন প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী। ১৯৬৭ সালে তিনি এই বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধানশিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর শিক্ষকজীবনের এটাই শেষ বছর। প্রধানশিক্ষকের নিজের বিষয় ইংরেজি। প্রতি বছর প্রায় ৮০ জন ছাত্র এখান থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে শতকরা ৫০ জন প্রথম বিভাগে এবং বাকিরা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। প্রায় প্রতি বছরই প্রথম কুড়িজনের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র থাকে।

*কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যাবে,* এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবসু বললেন, "অধ্যবসায়, ধৈর্য, মনঃসংযোগ এবং পরিশ্রমই ভাল ফল করার মূল সূত্র। পরীক্ষায় ভাল করার আগ্রহ থাকা চাই। এটাই গোড়ার কথা।"

তিনি আরও বললেন, "স্কুল কামাই করা একেবারেই চলবে না। তাতে পড়াশোনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। ক্লাসে সবসময় মনোযোগী হতে হবে। পরীক্ষার হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারার জন্য একই সময়সীমা মেনে টেস্টপেপারের প্রশ্নের উত্তর করা উচিত।"

*কীভাবে ইংরেজি পড়তে হবে,* প্রশ্ন করতে শ্রীবসু বললেন, "পড়ার সময়েই প্রতিটি শব্দের বানান ও অর্থ জেনে নিতে হবে। নতুন নতুন শব্দ বা শব্দসমষ্টির ব্যবহার, বাক্যগঠন ইত্যাদি লক্ষ করতে হবে।"

*বাংলা সম্পর্কে* তিনি জানালেন, "মাতৃভাষা বলে অনেক ছাত্রছাত্রীই বাংলাকে বড্ড সহজভাবে নিতে চায়। সেই কারণেই তারা বাংলায় ভাল নম্বর পায় না। প্রশ্ন সাজিয়ে নিয়ে নিয়মিত উত্তর লিখতে হবে। রচনা, ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি লেখার অভ্যাসের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাকরণের কয়েকটি সংজ্ঞা মুখস্থ না-করে, পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক ব্যাকরণ অভ্যাস করা দরকার।"

জিজ্ঞেস করেছিলাম, *অঙ্ক কেমন করে করতে হবে।* উত্তরে প্রধানশিক্ষক জানালেন, "অঙ্ক সম্পর্কে যে অযথা ভয় অনেকের রয়েছে, সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পারলেই অঙ্ক কষা অনেক সহজ হয়ে যায়। নিয়ম করে প্রতিদিনই কিছু অঙ্ক করা উচিত। যান্ত্রিকভাবে অঙ্ক মুখস্থ না করে, অঙ্কটি বুঝে করলে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।"

*বিজ্ঞান পড়া* সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: "আজকাল বিজ্ঞানে বেশিরভাগই ছোট ছোট অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন থাকে। সাধারণত সেগুলির উত্তরও হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু জ্ঞাতব্য বিষয়টি না-বুঝে মুখস্থ করলে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত দখল আনার জন্য একটু বিস্তৃতভাবে পড়ার প্রয়োজন আছে।"

*ইতিহাস-ভূগোল* পড়া সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল: "ইতিহাসে ভাল উত্তর লিখতে হলে ভাষার উপরেও দখল থাকা চাই। জানা জিনিসটিই ভালভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হবে। প্রকাশশৈলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে ভাবে, ইতিহাসের উত্তর দীর্ঘ করে লিখতে হয়। এটা ভুল ধারণা। ভূগোলও অনেকটা অঙ্কেরই মতো। সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যভিত্তিক উত্তর চাই। ম্যাপ এঁকে লিখতে পারলে খুব ভাল।"

*কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা* বিষয়ে তিনি বললেন, "স্কুলে যে কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে মন দিয়ে সেটি অনুশীলন করা দরকার। কাজের নিয়মিত ডায়েরি রাখতে হবে। নিজের কাজটুকু নিজেই করা উচিত।"

আনন্দমেলা সম্পর্কে শ্রীবসু বললেন, তিনিও "আনন্দমেলার নিয়মিত পাঠক। আর ছোটরা তো এর অনুরাগী বটেই।"

---

আগামী সংখ্যায়

**বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুল**

## ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

উত্তরপাড়া সরকারি হাইস্কুলে এবার ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে রজত মুখোপাধ্যায়। রজত ক্লাস ওয়ান থেকেই এখানে পড়ছে। তাদের ক্লাসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব বেশি। এবারে সেকেণ্ড হয়েছে পবিত্র ভট্টাচার্য। মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে রজত পেয়েছে ৭০০ এবং পবিত্র পেয়েছে ৬৮৬।

রজত থাকে বালিতে। তার বাবা কলকাতা বিদ্যুৎ করপোরেশনে চাকরি করেন। বাড়িতে বাবা, জ্যাঠা এবং দাদুর কাছ থেকেই সে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পায়। তা ছাড়া স্কুলের মাস্টারমশাইরা তো আছেনই। রজতের পড়াশোনার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। তবে সে দিনে অন্তত চার ঘণ্টা পড়েই। আর যেদিন ভাল লাগে, সেদিন সারাদিনে মোট ১৪-১৫ ঘণ্টাও হয়ে যায়। সব প্রশ্নই রজত লিখে তৈরি করে।

রজত ইংরেজি গ্রামারে পি· কে· দেসরকার ছাড়াও মিত্র-মিলফোর্ডের নতুন প্রকাশিত বইটি অনুশীলন করে। অঙ্কে অবজেকটিভ অংশের জন্য অমিতাভ মিত্র ও প্রণবেশ জানার অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তরের বইটি থেকে সাহায্য পায়। ভৌত বিজ্ঞানে স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়াও পদার্থবিদ্যা অংশের জন্য অলক চক্রবর্তীর ও রসায়ন অংশের জন্য রঞ্জিত দাসের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর বইটি তার খুব কাজে লাগে।

বড় হয়ে কী হওয়ার ইচ্ছে আছে, এই প্রশ্নের জবাবে রজত জানিয়েছে, সে অবশ্যই ডাক্তার হওয়ার চেষ্টা করবে। তার বাবা ছাড়া বাড়ির পুরুষরা প্রায় সবাই ডাক্তার।

আনন্দমেলায় যে ভ্রমণকাহিনী বার হয়, সেটাই তার বিশেষ প্রিয়।

—অপরাজিতা

## ম্যাজিশিয়ান

আশা দেবী

ম্যাজিক দেখায় কিষ্টচরণ,
অনেক রকম ধরন-ধারণ,
হেসে কেঁদে নানান মতে,
বাড়িয়ে চলে নিজের দর।

কিষ্ট বলে, "এখন বলি,
নিয়ে এসো টাকার থলি,
দ্বিগুণ পাবে, ভাবছ খালি,
ভরসা রাখো আমার 'পর।"

লোভী মামা আনল ঝাঁকা,
ভর্তি তাতে অনেক টাকা,
কিষ্ট বলে, "চোখটা বোজো
মনের ভেতর দেব্‌তা খোঁজো
চোখটা খুলে দেখতে পাবে
বসে আছ টাকার 'পর।"

চোখদুটো যেই খুলল মামা,
দেখে, গায়ে নেইকো জামা,
পিঠটা রোদে হচ্ছে ঝামা,
কেউ কোথা নেই, শূন্য ঘর ॥

ছবি : বিমল দাস

# তিনিমশাই

সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়

গলা তাঁর চাঁচাছোলা,
খান তিনি কাঁচা ছোলা
সকালে।
দোকানিকে দিয়ে টাকা,
কন তিনি, "পেয়ে বোকা
ঠকালে ?"

রাত্তিরে নিরিবিলি
মুখে গুঁজে দুই খিলি
মিঠে পান
টপ্পা ভজন আর
কালোয়াতি গোটা-চার
গীত গান।

সেই তাঁর চিৎকারে
সকলের প্রাণ কাড়ে
নিত্য।
রোজের রেওয়াজে তাঁর
জ্বলে যায় পাড়াটার
পিত্ত।

তা শুনে মাধাইটার
মুলতানি গাইটার
গোয়ালে
ঘুম ভেঙে যায় কাঁচা
রাতটুকু যায় বাঁচা
পোয়ালে।

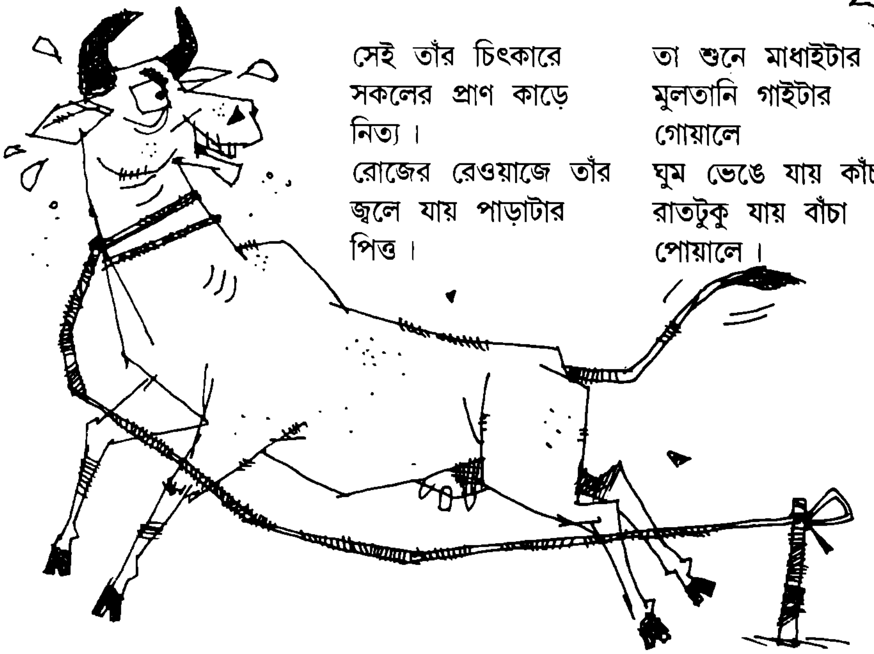

ছবি : দেবাশিস দেব

# ত্রি-ফলার বিবরণ

হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, "কাজেই লেখার যে যুক্তাক্ষর, তার উচ্চারণের নানা ঝামেলা রয়েছে। এই ধরো ত্রি-ফলা, মানে য-ফলা, ব-ফলা আর ম-ফলা।"

ভণ্টু হঠাৎ বলে বসল, "কাকু, কথার মাঝখানে কথা বলছি বলে কিছু মনে কোরো না। বাবা যে বলছিল পর পর দুটো ব্যঞ্জন মিলে যুক্তব্যঞ্জন—কথাটা কি ঠিক ? কারণ এক্ষুনি আমার মনে পড়ল, 'স্ত্রী'-তে যে 'স্ত্র' আছে, তাতে তিনটে ব্যঞ্জন পরপর—'স্', 'ত্' আর 'র্'।"

"সুপিরিয়র কিড্ !" বলে ভণ্টুর পিঠ চাপড়ে দিলেন হিগিনকাকু। "বালক, তুমি অভ্রান্ত কথা বলেছ। বাংলায় দু-বর্ণের যুক্তাক্ষর প্রচুর আছে, বেশ কিছু তিন-বর্ণের যুক্তাক্ষরও আছে। কিন্তু আমরা দু-বর্ণের যুক্তাক্ষরগুলোর কথা আগে সেরে নিই, কেমন ?" বলে বলতে আরম্ভ করলেন, "যে যুক্তাক্ষরগুলো একই বর্ণের দুটো মিশে তৈরি হয়েছে, সেগুলো নিয়ে কোনো বিপদ নেই। যেমন ক্ক, চ্চ, ট্ট, ত্ত, ব্ব, ম্ম, ল্ল ইত্যাদি। একবারে দুটো উচ্চারণ করে গেলেই হল। কিন্তু ধরো ক্য, চ্য, ত্ব, শ্ব, দ্ম, স্ম ? ঐ য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা ? তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথম ব্যঞ্জনটার সঙ্গে য বা ব বা ম জুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ য বা ব বা ম কি উচ্চারণ করি

আমরা ? নাইন ! নাইন !" জার্মানভাষায় 'না, না' বলে শেষ করলেন হিগিনকাকু।

"তবে কী করি ?" ভণ্টুর বাবার দিক থেকে প্রশ্ন এল।

"সাধারণভাবে য-ফলা, ব-ফলা বা ম-ফলা থাকলে দুটো জিনিস করি। এক, শব্দের গোড়ায় যদি এই ফলাওয়ালা যুক্তাক্ষর থাকে, তাহলে শুধু প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণটারই উচ্চারণ করি, ফলার উচ্চারণকে গুলি মেরে দিই। যেমন য-ফলা শব্দের প্রথম অক্ষরে 'অ্যা' হয়ে যায়—ব্যয়, ব্যক্ত, ব্যবহার ; ব-ফলার কিছুই থাকে না—শ্বাস [শাশ্], ত্বক [তক্], ক্বাথ [কাথ্], স্বপ্ন [শপ্নো] ; আর ম-ফলাও নাকি-কান্না কেঁদে বিদায় নেয়—স্মরণ [শঁরোন্], স্মিত [শিঁতো]। আর শব্দের গোড়ায় যদি না থাকে—"

এমন সময় ঐ কৃষ্ণকায় কফি এবং রুচিকর প্যাটিজ এসে হিগিনকাকুর মুখ বন্ধ করল। (ক্রমশ)

বাচস্পতি



# ইস্কুল যাওয়া

খুব ছোটবেলায় চামেলি যখন প্রথম ইস্কুলে ভর্তি হল, তখন সে ইস্কুল যাবার সময় হলেই মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিত।

Milly hated going to school.
Every morning Mummy had quite a difficult time getting her ready for school.
She'd beg Mummy to let her stay at home.
But Mummy would pay no heed to her requests.
"You hate school now," she'd say, "but soon you'll begin to like it."
"You'll make new friends at school," Mummy would say, "and you'll like going to school so that you can play with them.

মা যা বলেছিলেন, তা-ই হয়েছে,

After only a few days Milly started liking her school.
She began to like getting up early to get ready for school.
If the school-bus was late for some reason, she'd grow quite anxious.
When the bus came at last, she'd run to it and greet her friends happily.
Her friends would greet her in chorus.
She'd jump into the bus and wave to Mummy, smiling happily.

এখন তো বেশি দিন ছুটি থাকলে মিলির মাঝে-মাঝে ইস্কুলের জন্যে মন কেমনই করে।

Now-a-days she sometimes feels she'd rather go to school than stay at home.
During long vacations she would sometimes think of her school, her friends, her teachers.
Getting up in the morning, she'd remember that the school bus won't come for her, and she'd feel a little sad.
She'd like it very much if she suddenly saw the bus coming.
Of course, she likes holidays, too.
And, on some mornings, she feels she'd like to stay at home.
"How'd I like it if the school bus doesn't come this morning?" she'd ask herself.
"Very much indeed," she'd answer.

এবারে লক্ষ করো :

Milly hated going to school.
Soon you'll begin to like it.
You'll like going to school.
She began to like getting up early.
She'd like to stay at home.
"How would I like it if the bus doesn't come?"

প্রসাদ

# রিয়া...

## ...সতেজ সুন্দর অনুভূতি!

মনোরম সৌরভে
ফুল রিয়া
আর লেবু রিয়া

| ফুল রিয়া | লেবু রিয়া |
|---|---|
| কোমল ও মৃদু! | শীতল ও তরতাজা করা! |
| সৌখিন গোলাপী সাবান | চন্মনে সবুজ সাবান |
| ফুলের হাল্‌কা সৌরভে! | লেবুর লোভনীয় সৌরভে! |

## রিয়া সুরভিত সাবান

টাটার তৈরী

CASTR-8-223 BEN

# সোঁদরবনের বাঘ

## কমলেন্দু দাক্ষিত

সোঁদরবনের বাঘ দেখেছ ?
সোঁদরবনের বাঘ ?
লাল্‌চে হলুদ শরীরে তার
কাল্‌চে ডোরা দাগ।
জ্যান্ত মানুষ শিকার পেলে
রক্ত মাংস হাড়
মুহূর্তে সাফ, বেজায় তেজী,
লম্ফে পগার পার।
জমকালো গোঁফ মুখের শোভা,
কী ভয়ানক রাগ !
কণ্ঠ থেকে আওয়াজ ছাড়ে,
যেন মেঘের ডাক।
জলে কুমির, ডাঙায় গাছে
ভয়াল ময়াল সাপ,
এদের সঙ্গে লড়াই জমে
দারুণ, বাপ রে বাপ।
সোঁদরবনের বাঘ দ্যাখোগে
আলিপুরের খাঁচায়,
বাঘের গায়ের বিকট গন্ধ,
আতরে প্রাণ বাঁচায়।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

# দুই সাহসী

## রূপক চট্টরাজ

নিশুত রাতে হচ্ছে ছাতে
তুমুল দাপাদাপি
ভূতের ভয়ে ভিরমি খেল
রানা এবং বাপি।
হচ্ছে মনে ছাতের কোণে
ভূত নাচছে বেড়ে
ধিনতা-ধিনা মামদো নাচে
কাঁধকাটা যায় তেড়ে।
ধুপ ধুপা ধুপ আওয়াজ আসে
বেঘুমে রাত কাটে,
দুই সাহসী এক্কেবারে
চুপসে কাদা খাটে।
ভোর না হতেই ছুটল ছাতে
ভূত না দেখি জিন—
চক্ষু ছানাবড়া, হাওয়ায়
গড়ায় ফাঁকা টিন !

ছবি : অহিভূষণ মালিক

# যেদিন আমার খোকন দাঁতের গর্ত আবিষ্কার করলো !

## ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড

**স্বাদ আর ফেনা ওয়ালা এমন টুথপেস্ট যা দাঁত আর মাড়ি দুইই রক্ষা করে।**

331F244 BEN

"এবারের ধাঁধাটা গৌরী পাঠিয়েছে।" ছোট্‌কা ধাঁধার খাতা খুলতে-খুলতে বলল, "আর তাই ধাঁধাটা মেয়েদের নিয়ে। মেয়েদের নাম আর শাড়ির রঙ নিয়ে। তবে হ্যাঁ, ধাঁধাটা তা বলে মোটেই শুধু মেয়েদের জন্য নয়। সকলের জন্যই। বেশ বুদ্ধি-খেলানোর ধাঁধা।"

আমি আর কী বলব। কবে যে গৌরী পাঠাল, তাও জানি না। আর কতটা বুদ্ধির ধাঁধা তাও বলতে পারব না। সুতরাং ছোট্‌কার কথার জবাব না দিয়ে লিখে ফেললাম।

**প্রথম ধাঁধা ॥** তিনটি মেয়ে। কলেজের মেয়ে। শাড়ি পরে।

মেয়ে তিনটির নাম লালি, নীলা আর শুভ্রা। পদবি বলছি না, কেননা দরকার নেই। নামটাই দরকার।

একদিন হল কী, তিনজনেই কলেজে এসে অবাক। লাল নীল আর সাদা রঙের তিনটে শাড়ি তিনজনের পরনে। তবে কিনা, নামের সঙ্গে মিলিয়ে কেউই শাড়ি পরেনি। অর্থাৎ লাল

পরেনি লালি, সাদা শাড়ি নয় শুভ্রার পরনে, নীলার শাড়ির রঙও নীল নয়। তবে তিন রঙের শাড়িই রয়েছে।

"আমাদের মধ্যে কেউই দেখছি নিজের নামের সঙ্গে মানানসই শাড়ি পরেনি।" বলল, তিনজনের মধ্যে সেই মেয়েটি, যার পরনে ছিল সাদা রঙের শাড়ি।

"হ্যাঁ। তাই তো দেখছি। তবে রঙ তিনটেই রয়েছে।" জবাব দিল লালি।

না, আর কিছু বলার নেই।

এ থেকেই বলতে হবে কে কী রঙের শাড়ি পরেছিল সেদিন।

**দ্বিতীয় ধাঁধা ॥** ঠিক না ভুল ?—

ইংরেজি একবিংশ শতাব্দী শুরু হবে ১ জানুয়ারি, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে।

**তৃতীয় ধাঁধা ॥** জট ছাড়াও—

**বঙ্গতিলকাল**

**গতবারের উত্তর ॥** (১) প্রথম দিনে ৪, দ্বিতীয় দিনে ৭, তৃতীয় দিনে ১০, চতুর্থ দিনে ১৩, পঞ্চম দিনে ১৬। মোট ৫০। (২) সাত বছর বয়স হয়। (৩) হঠকারিতা।

সত্যসন্ধ



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ■ | ৫ | | ৬ | | ৭ | ■ |
| ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| ৮ | | ■ | | ■ | ৯ | ১০ |
| | ■ | ১১ | | ১২ | ■ | |
| ১৩ | | | ■ | ১৪ | | |

**সংকেত** : পাশাপাশি : (১) ছবি আঁকতে লাগে। (৩) মলাট। (৫) নদী ও সমুদ্রে দেখা যায়। (৮) কারো কারো মাথায় থাকে। (৯) সংগীতে রাগিণীবিশেষ। (১১) একই নামে হরিণ ও মাছ। (১৩) বনের ভিতর ঘর, অসুখ কম্পজ্বর। (১৪) অনেক সন্ন্যাসীতে কী নষ্ট ?

উপর-নীচ : (১) প্রাচীন রণবাদ্য। (২) দাঙ্গা-হাঙ্গামা। (৩) মানুষের বিশেষ গুণ বা যোগ্যতা। (৪) তৃণ। (৫) আলো নিয়ে ওড়ে, ইতিউতি ঘোরে। (৬) অনিমন্ত্রিত আগন্তুক। (৭) শূন্যস্থান পূরণ করো : খাবার আর খবর,—হলে জবর। (৮) পক্ষিবিশেষ। (১০) শৌখিন ঘোড়ার গাড়ি। (১১) গলায় পরে, আড়াল করে। (১২) আঁকশি।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রা | গ | বি | ■ | ফা | নু | স |
| জ | ■ | ধু | ■ | ল | ■ | ত্যে |
| শে | লি | ■ | ■ | ■ | ম | ন্দ্র |
| খ | লি | শা | ■ | অ | ধু | না |
| র | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | থ |
| ব | ■ | শৃ | ■ | ধু | ■ | দ |
| সু | ড় | ঙ্গ | ■ | নি | মি | ত্ত |

## মজার খেলা

ষোলটা দেশলাইকাঠি যোগাড় করো প্রথমে। ব্যবহার-করা কাঠি হলেও ক্ষতি নেই। তারপর নীচের ছবির মতন করে টেবিলে সাজাও।

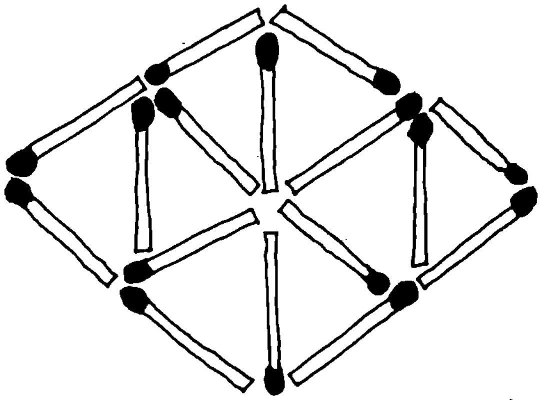

ব্যস, তুমি মজার খেলার জন্য তৈরি।

এইবার কোনো বন্ধুকে ডাকো।

তাকে বলো, সে যেন এই ষোলটা কাঠি থেকে এমনভাবে চারটে কাঠি সরিয়ে নেয়, যাতে টেবিলের ছবিতে মাত্র চারটে ত্রিভুজ পড়ে থাকে।

এখন আছে আটটা ত্রিভুজ, ষোলটা কাঠি। তখন হবে বারোটা কাঠি, চারটে ত্রিভুজ।

কী, বন্ধু পেরেছে? তাহলে তো সে দারুণ বুদ্ধিমান। অভিনন্দন জানাও তাকে।

কিন্তু না পারলে?

তখন তোমাকে নিজে করে দেখাতে হবে। তাই নিজেই আগে সমাধানটা করে ফেলো, তারপর বন্ধুকে সমস্যাটা দাও।

আমি কীভাবে করেছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি নীচে।

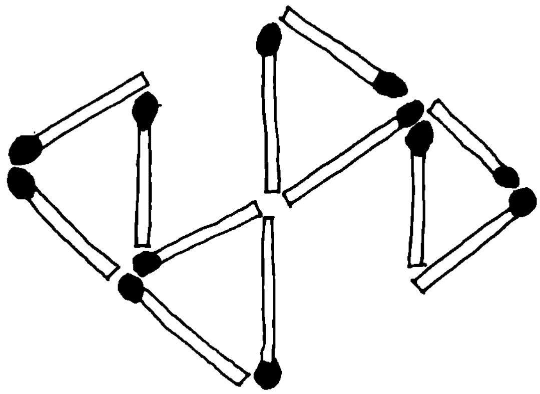

এটা কিন্তু আগে দেখবে না। কেমন?

**মজারু**

## উত্তর বটে

প্রঃ খরগোশরা গাজর খেতে ভালবাসে তা তো জানি, কিন্তু আমার চোখের জন্য গাজর খেতে বলছেন কেন?
উঃ কোনো খরগোশকে আপনি চশমা পরতে দেখেছেন?

প্রঃ হাতিটা তো চিড়িয়াখানার, তা এটা মরেছে বলে এত কাতর হয়েছ কেন?
উঃ ওটাকে কবর দেবার ভার যে আমার ওপর!

প্রঃ আমার কাছে গতবছর ঠিক এই দিনে আপনি ১০০ টাকা ধার করেছিলেন, সেটা কি আপনার খেয়াল আছে?
উঃ সত্যিই খেয়াল ছিল না। হ্যাপি বার্থ ডে!

**সুসেন**

## হাসিখুশি

সিনেমায় অভিনয় করতে আসা যুবকটিকে পরিচালক বললেন, "আপনি এখন যেতে পারেন। আমার কোনো ছবিতে বৃদ্ধের প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাব।"

"কিন্তু আমি তো যুবক। আমাকে দিয়ে ...."

"চিন্তার কিছু নেই। যখন চিঠি পাবেন, তখন আপনি বুড়োই হয়ে যাবেন।"

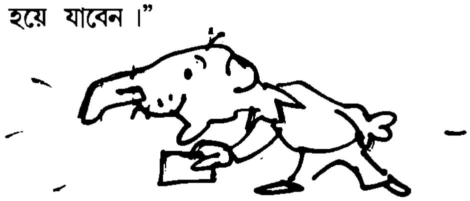

কাপড়-কাচা সাবান বিক্রি করে কোটিপতি হওয়া ব্যবসায়ীকে খবরের কাগজের এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কীভাবে জীবনযাপন করে এত বড় ধনী হলেন?"

হেসে জবাব দিলেন ব্যবসায়ী, "পরিষ্কার জীবনযাপন করে।"

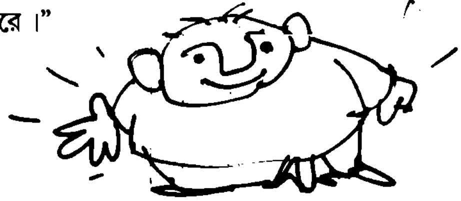

"গত সপ্তাহেই তুমি বললে, পুজোর ছুটিতে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। আর এখন বলছ দার্জিলিং নয়, রাজস্থান। কী ব্যাপার বলো তো?"

"তোমাকে কী বলেছিলাম মনে নেই, কিন্তু মনে রেখো সত্যি কথাটা আমি একটু কম বলি।"

"ঘরে সব দামি দামি জিনিসপত্র, আর তুমি দরজা খোলা রেখে শুয়েছ?"

"কী করব? আমি যে মানুষের কষ্ট দেখতে পারি না। দরজা খুলতে চোরের কষ্ট হবে না?"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
উয়েফা কাপের প্রথম পর্যায়ের খেলায় রোভার্স বনাম হিকলাভিক ১—১ ড্র। ডার্লটনের সঙ্গে খেলায় ভিক গাথরিকে নামানো হয়েছে।
উফ!
যাঃ!
বল কেড়ে নিয়ে রয় এগোচ্ছে
DARLTON
ROVERS
প্যাকোকে বল দিতেই ...
ঢুকেছে!
শাবাশ প্যাকো!
হেকলাভিক বরাত-জোরে ড্র করেছে!
ফিরতি-খেলায় তাদের গো-হার হারাব!
ডার্লটন পাল্টা-আক্রমণ চালিয়েছে ...
চার্লি কোনোক্রমে বল ফেরাল!
ন' নম্বরের পায়ে পড়লে সর্বনাশ!
কিন্তু গাথরি আটকেছে!
মারো ডার্লটন!
কিন্তু ...
ভিক সত্যি দারুণ বাঁচিয়েছে!
ক্লিয়ারেন্স!
হঠাৎ ...
ধরো না, জেরি!
তুমি ধরো রয়!
যাঃ!

ডালটনের ভক্তেরা উদ্বিগ্ন ...
সর্বনাশ !
রয় একেবারে বক্সে ঢুকেছে !
রকেট ছেড়েছে !
টু-নিল !
খেলা-শেষে রোভার্স তিন গোলে জয়ী ...
ওঃ, দারুণ !
শাবাশ রয়, শাবাশ !
ধন্যবাদ !
খানিক বাদে, ড্রেসিং রুমে ...
রোভার্স শীর্ষস্থানে, কারফোর্ডের চেয়ে পাঁচ পয়েণ্ট এগিয়ে !
দ্যাখো, দ্যাখো !
রোভার্স ৪৮
কারফোর্ড ৪৩
টাইনকাস্টার ৪০
ম্যাজিক !
মনে হচ্ছে, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানস' কাপে এবারে আমরাই খেলব !
কী বলো রয় !
আগে তো উয়েফা কাপের খেলাটা হোক !
খেলার শেষে, সাংবাদিক বৈঠকে
ফিরতি খেলায় হেকলাভিক হারবেই, তাই না ?
আশা তো করি !
০-০ ফল হলে হেকলাভিকের লাভ। কেননা, বিদেশের মাঠে এক গোল মানে দু' গোল।
হঠাৎ ...
রয়, শিগগির রিসেপশন লাউঞ্জে এসো !
কী হয়েছে ?
মার্ভিন বেহুঁশ ! প্যাকোর পেটেও ভীষণ যন্ত্রণা !
দুজনেই দারুণ অসুস্থ !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)
কী হল ওদের ?

# সন্ন্যাসীর থলে

মনোজ বসু

চৈত্রের শেষ। অর্জুনের বড় স্ফূর্তি। দেশে-ঘরে যাচ্ছে সে একটানা তিন বছর আবাদ অঞ্চলে চাকরি-বাকরি করে। তিন বছরের পুরো মাইনে পকেটে। বার্ষিক ছ'টাকা হিসাবে, তিন-ছয়ে আঠারোর উপরেও সদাশয় মনিব বখশিস্ ধরে দিয়েছেন দু'টাকা। পুরোপুরি কুড়ি। চাট্টিখানি কথা নয়।

স্ফূর্তির তাই অবধি নেই। এত টাকা কিসে খরচ করবে অর্জুন কূল-কিনারা পায় না। হাঁটছে না সে, নেচে-নেচে যাচ্ছে। আর গান ধরেছে। সে উদ্দণ্ড গানের ঠেলায় গাছের পাখপাখালি পালানোর দিশা পায় না।

বিষম রোদ, জলতেষ্টা পেয়ে গেল। তেপান্তরের মাঠ—জনমনিষ্যি দেখা যায় না কোনো দিকে। জল বিনা প্রাণ আইঢাই করছে।

যেতে যেতে মাঠ-জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি দেখা গেল। পুরোপুরি বাড়ি নয়। ছিল বোধহয় এক কালে পাকাবাড়ি, ভেঙেচুরে এখন ইটের স্তূপ। আর আগাছার ঘোর জঙ্গল। একটা-দুটো ছোট ঘর খাড়া আছে, ঠাহর করে-করে এখনও আন্দাজ পাওয়া যায়। মানুষ আছে কি না, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন চিৎকার করে, "আছেন কেউ ভিতরে? মানুষ থাকেন তো মুখে বলুন, আছি। ভূত হন তো গাছের ডাল ভাঙুন।"

অতি ক্ষীণ আওয়াজ এল গাছগাছালির ভিতর দিয়ে। মানুষ চলাচলের পথও একটু আছে, নজরে পাওয়া যায়।

অর্জুন আবার ডাক দেয়, ভাল করে সন্দেহ নিরসনের জন্য। পুনশ্চ আওয়াজ। আওয়াজের আন্দাজে ভিতরে ঢুকে গিয়ে দেখল, ভাঙা তক্তাপোষে ছেঁড়া মাদুরের উপর ঢাউস রকমের মোটা এক বুড়ো মানুষ। বৃদ্ধ কেঁদে বলেন, "ঠাকুর তোমায় পাঠালেন।"

অর্জুন ঘাড় নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না, কেউ পাঠাননি আমায়। জলতেষ্টা পেয়েছে, তেষ্টার টানে এসে পড়েছি। দাদুমশায়ের নিজের বোধহয় ওঠার তাগত হবে না, মুখে বলে দিন, জল কোথায়! জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে তারপর আপনার কথাবার্তা সব শুনব।"

গৃহকোণের মেটে কলসি দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন, "কলসি রয়েছে, কিন্তু জল নেই। ন্যাড়া বলে এক ছোকরা থাকত আমার সঙ্গে। দেখাত যেন কত বড় ভক্ত। পরশু সকালে বার আষ্টেক ঘোরতর রক্তবমি হল আমার। বাঁচব না বুঝে সেই রাত্রেই ন্যাড়া যথাসর্বস্ব নিয়ে পিটটান দিয়েছে। এখন আমি একা, একেবারে নিঃস্ব।"

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এতসব দুঃখের কাঁদুনি শোনার ধৈর্য অর্জুনের নেই। কলসি নেড়েচেড়ে দেখল, জল এক ফোঁটাও নেই। বলে, "পুকুর-টুকুর কোন্ দিকে দেখিয়ে দিন। জল খেয়ে আসি আগে। নিঃস্ব না লাখপতি, কোন্টা আপনি, সে বিবেচনা তারপরে।"

জঙ্গুলে পুকুরঘাটে নেমে চার-পাঁচ আঁজলা জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে অর্জুন ফিরে এল। বলে, "বলুন এইবারে, শুনি।"

মিনমিন করে ক্ষীণকণ্ঠে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, "সাধুচরণ আমার নাম। স্ত্রী মারা যাবার পর দুত্তোর বলে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। কাজকর্ম ব্যাপার-বাণিজ্য সমস্ত ছেলের কাঁধে। মধুগঞ্জে তার বড় গোলদারি দোকান। সে সেই সমস্ত নিয়ে আছে। আর আমার কাজ পাহাড়ে, জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীর তল্লাসে ঘোরাঘুরি, তাঁদের ভজন-পূজন। গায়ের এই গৈরিক কাপড়-চোপড়ের গুণে আমা হেন লোকেরও মাঝে-মাঝে দিব্যি শিষ্য-সাকরেদ জুটে যায়। এই তল্লাটে আস্তানা নেওয়ার পর সর্বশেষ জুটেছিল ন্যাড়া। গোড়ায়-গোড়ায় খুব সেবা করত সে, সর্বরকমে, রেঁধে খাওয়ানো থেকে শয়নের পর গা-হাত-পা টেপা অবধি। যখন-তখন আমার রক্তবমি দেখে সে বুঝে নিল, আমার দিন আর বেশি নেই। রাত্রিবেলা টাকার থলি আর হাতের মাথায় যা কিছু পেল, সমস্ত নিয়ে পিটটান। আমি এখন নিঃসম্বল। এত ধকল কাটিয়ে যে আবার উঠব এমন মনে হয় না।"

"উঠবেন কি পড়বেন, আমি যখন এসে গেছি, কদিনের মধ্যেই টের পাওয়া যাবে। দেখুন, মহাভারতের অর্জুন লড়াইয়ে হারত না। আমি এই কলির অর্জুন, হারিনে আমিও।"

মুখে বড়াই করে রোগীকে ভরসা দেয় অর্জুন। আর সেবাও করছে সে প্রাণপণে। বলে, "তিন বছরের মাইনে ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরছি। মাইনের উপরে আরও বখশিস্। ভয় হয়েছিল, এ-বোঝা সারাজীবন বয়ে বেড়াতে না হয়। খরচের ভাল উপায় বেরিয়ে গেল। চিকিচ্ছের কোনোরকম ত্রুটি হবে না দাদু। রক্তপিত্তই হোক আর রাজযক্ষ্মাই হোক, 'বাপ বাপ' করে পালাবে।"

তারপর কবিরাজবাড়ি ছুটোছুটি, হাটে-মাঠে ওষুধ সংগ্রহ। হপ্তা কাটল। তিন বছরের মাইনের সঞ্চয় নিয়ে অর্জুনের বড় গর্ব, তার প্রায় আধাআধি কাবার। কিন্তু রোগের উপশমের লক্ষণ নেই। গলা চিরে রক্ত বেরোচ্ছে ঠিক যেন নিয়ম করে একদিন অন্তর। কবিরাজ অর্জুনের কানে-কানে বলে দিলেন, "রাজব্যাধি এর নাম, রাজরাজড়ার ঘরে পোষায়। পথের মানুষ তুমি, কেন উড়ে এসে ঘাড় পেতে দিলে ? করতে পারবে না কিছুই, মিছে বদনামের ভাগী হওয়া। সাধুমশায়ের ছেলে শুনেছি বিষম বদরাগী, আর মামলাবাজ। চেষ্টা-যত্ন করছ, আমি ভয় করছি পরিবর্তে তোমার হাতে-দড়ি না পড়ে।"

বাজে কথা, ভয় দেখানো কথা—অর্জুন এসব কানে নেয় না। আসলে কবিরাজ নিজে হালে পানি পাচ্ছেন না, তাই ভয় দেখিয়ে অর্জুনকে ভাগিয়ে দেবার মতলব। ন্যাড়াকেও এমনিধারা দুষ্টমন্ত্র দিয়েছিলেন কি না কে জানে। কবিরাজের সঙ্গে শেষাশেষি খুবই জমজমাট হয়েছিল নাকি তার।

কবিরাজের কথা অর্জুনের কানে যায়, মনে বসে না। তারপর সাধুচরণ নিজেই একদিন অর্জুনকে বললেন, "মুখে রক্ত ওঠা আমার আজকের ব্যাধি নয়। ষোল আনা সংসারধর্ম ব্যাপার-বাণিজ্য নিয়ে ছিলাম, তখনও মাঝেমধ্যে এইরকম রক্ত উঠত। তুমি বাবা অনেক করছ—এমন সেবা অনেককাল আমি পাইনি। কিন্তু বুঝতে পারছি, এখন এ-বয়সে আর কিছু হবার নয়। মধুগঞ্জ নামে যে গঞ্জ-জায়গাটা, দেখেছ তুমি ? চোখে না দেখলেও নাম শোনা আছে নিশ্চয় ?"

অর্জুন ঘাড় নেড়ে দিল। দেখেনি সে মধুগঞ্জ, নামও শোনেনি। সাধুচরণ বলে যাচ্ছেন, "বাদাবন নয় সেটা, বরঞ্চ মানষেলা জায়গা। বন্দর। বাদাবন সেখান থেকে দশ-বারো ক্রোশ দূর। রবিবারে বিষ্যুতবারে হাট বসে, দক্ষিণবাদার অন্তত অর্ধেক কেনাবেচা ঐখানে হয়। আমার ছেলে ভৃগুচরণের মস্ত বড় গোলদারি দোকান, ঐখানটায় পৌঁছে দাও বাবা। বউমা-নাতিপুতিরাও সেখানে। তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো। শেষ কটা দিন ছেলেবউয়ের সেবা নেব, বড় ইচ্ছা আমার। প্রাণ ভরে আমি তোমায় আশীর্বাদ করব।"

অর্জুন শিউরে উঠে বলে, "ওরে বাবা ! অত পথ নিয়ে যাব কেমন করে ? নজর দিতে নেই, ওজনেও বেশ তো ভারিক্কে-সারিক্কে আছেন।"

সাধুচরণ সে-কথা হেলায় উড়িয়ে দেন, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—থলিতে ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চলে যেও। মজাই লাগবে ! আর এক কাজ করতে পারো, সেইটে আরও ভাল, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। মধুগঞ্জের হাটবার বুঝে আমাদের কানাইডাঙায় বটতলার ঘাটে চলে যেও। হাটুরে নৌকো বিশ-ত্রিশখানা ছাড়ে ওখান থেকে, তারই একটায় ব্যবস্থা করে নিও। হাঁটতেই হবে না তাহলে, শুয়ে-বসে আরাম করে পৌঁছে যাবে।"

"তা হলেও কানাইডাঙা অবধি বয়ে নিয়ে যাওয়া থলিতে, সেও বড় চাট্টিখানি কথা নয়। আর আস্ত হাতি-ঘোড়া পুরে ফেলব থলিতে, তেমন থলিই বা পাচ্ছি কোথায় ?"

"থলি আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার মতন লম্বা-চওড়া একজনকে নিয়ে যাচ্ছ, কেউ কিছু টেরই পাবে না। একটা তুলোর বালিশ কাঁধে পড়ে আছে, এমনি মনে হবে।"

ন্যাকড়ার শতজীর্ণ ছোট্ট এক থলি, বৃদ্ধ তাই বের করে দিলেন শিয়রের নীচে থেকে। হি-হি হা-হা করে হাসেন খানিক। "হাঁদারাম ন্যাড়াচন্দোর হতচ্ছেদ্দা করে জিনিসটা ফেলে গেছে। অথচ যা-কিছু আমার নিয়ে গেছে, সব জিনিসের সেরা জিনিস হল এই।"

আবার বলেন, "থলিটা নিয়ে নাও বাবা। মুখ আলগা করো। তারপর যাকে থলিতে ঢোকাতে চাও, তার চেহারার আদলটা আন্দাজি মনে এনে বিড়বিড় ছড়া বলবে—

*থলে দিল দেড়েল ভাই*
*ঢুকতে কোনো বাধা নাই*

আর অমনি দেখবে থলের মধ্যে সুড়ুত করে সেইজন ঢুকে গেছে, মানুষ হোক আর জন্তু-জানোয়ারই হোক।"

অর্জুন অবাক হয়ে বলে, "এই তো এক পুঁচকে থলে। চওড়ায় লম্বায় এক হাত দেড় হাতের বেশি হবে না। যদি ইচ্ছে করেন, আস্ত ঐরাবত ঢুকে যাবে এর মধ্যে ?"

সাধুচরণ তার কথা লুফে নিয়ে বলেন, "যাবে তাই। তোমার মনে ঐরাবত আসছে—আমায় দেখে নিশ্চয়। তা সম্ভব বটে। ঐরাবতের চেয়ে আমি খুব একটা কম যাইনে। বেশ তো, ছড়া পড়ে দ্যাখো তুমি পরখ করে যে, সত্যিই ঢুকে যাই, না বাইরে পড়ে থাকি।"

অর্জুন সাধুচরণের আপাদমস্তক আরও একবার দেখে নিয়ে থলির মুখ খুলে বিড়বিড় করে ছড়া পড়ে গেল।

অবাক কাণ্ড। অত বড় দেহ পলকে একটা বড় সাইজের পুতুলের মতন আকার নিয়ে টুক করে থলিটুকুর মধ্যে ঢুকে গেল। ঢুকে সগর্বে সাধুচরণ বললেন, "সত্যি না মিথ্যে বলছি, পরখ হল তো ? এইবারে এখন বাইরে বেরুনো, নয়তো চিরকাল আমায় এই থলির মধ্যে থেকে যেতে হবে। বাইরে যাবার জন্য আলাদা এক ছড়া—

*আদুড় গায়ে বাদুড় যায়*
*থলি থেকে বাইরে আয়।"*

ছড়া পড়ল অর্জুন আর থলি থেকে লহমার মধ্যে সাধুচরণ বেরিয়ে এলেন।

হরি হরি, এ কোন্ চেহারা সাধুচরণের। প্রায় এক বনবিড়াল। বনবিড়ালের মতন ভুরম্যাঁও ভুরম্যাঁও করছে। সেই ধরনের ডাক, তেমনি গলার আওয়াজ। আর সামনের পা দুটো বারংবার থলির মুখের দিকে তুলছেন তিনি। স্পষ্ট ইঙ্গিত : আমায় থলির মধ্যে ঢুকিয়ে দাও আবার। ঢোকাও, ঢোকাও ! পা দুটো জোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুনের নজর পড়ল, দু'চোখে জল গড়াচ্ছে বিড়ালরূপী সাধুচরণের। ভাল-মন্দ কিছুই না বুঝে অর্জুন ছড়া

পড়ে দিল, যাতে থলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। বনবিড়াল সাধুচরণ অমনি ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বনবিড়ালের ডাক গিয়ে খলখল খিকখিক মানুষের হাসির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে থলির ভিতর থেকে। বলছেন, "মস্ত বড় এক ফাঁড়া কাটল রে অর্জুন। স্বমূর্তিতে ফেরানোর ছড়া তোমায় শেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম। বাইরে বেরিয়ে থাকলে তখন আর উপায় নেই, বিশবার কি পঞ্চাশবার বললেও একটি বর্ণ তখন কেউ বুঝত না। বলছি এবার, শিখে নাও। 'আদুড় গায়ে বাদুড় যায়' এইসব বলেই তার ঠিক পরের কথা—

*বিনি সুপারির পানের খিলি*

*যা, হয়ে যা যেমন ছিলি।*

পুরো ছড়া পরখ করো এবারে তুমি।"

ছড়া পুরোপুরি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধুচরণ থলি থেকে বেরুলেন। আগেকার সেই বিরাট বিপুল চেহারা।

॥ ২ ॥

মিছে সময়ক্ষেপ নয়। রওনা এবার মধুগঞ্জে। সরাসরি নয় অবশ্য। আগে কানাইডাঙা ঘাট অবধি। এই পথটা সাধুচরণ যাচ্ছেন অর্জুনের কাঁধে চেপে থলির ভিতরের বনবিড়াল হয়ে। বার-তারিখ সমস্ত হিসাব করে নিয়েছেন। মঙ্গলবার রাত্রে কানাইডাঙার ঘাটে পৌঁছলেন। তারপরে সাধুচরণ আর বনবিড়াল নেই, থলি থেকে মুক্তি ঘটেছে। পুরোপুরি মোটকা মানুষ এখন। পথের অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। দোকান থেকে চিঁড়ে গুড় কিনে রাত্রির সেবা হল। ঝুরি-নামা বড় বটগাছের তলায় শুয়ে বসে রাত কাটানো হল।

ছোট-ছোট হাটুরে ডিঙি। খুদে ব্যাপারীরা ধানচাল খেজুরগুড়ের কলসি ফলমূল ইত্যাদি বোঝাই দিয়ে এ-হাটে সে-হাটে কেনাবেচা করে বেড়ায়, হাটুরে নৌকো সেইজন্য নাম। ভাড়া বাবদ পয়সা-কড়ি লাগে না, গতরের খাটনি খেটে দিতে হয়। বৈঠা বাওয়া, গুনটানা, চড়নদারদের জন্য রসুইবাস, তামাক সাজা, এই সমস্ত করতে হয়।

হাটুরে-ডিঙি রীতিমত এক দর্শনীয় বস্তু। ডাইনে বাঁয়ে ষোলোখানা বৈঠা। তা ছাড়াও এক অতিরিক্ত বৈঠা কাড়ালে মাঝির হাতে হালের কাজ করে। ষোলোবৈঠা সমতালে জলে পড়ছে, ডিঙি ছোট্ট একটা পাখির মতো নদীজলের গা বেয়ে উড়ে চলেছে যেন। বাতাস পেলেও ডিঙি পাল খাটাতে চায় না, বৈঠার গুণে যেন উড়ে বেড়ায়।

একটা ডিঙির কাছে গিয়ে অর্জুন বলল, "মধুগঞ্জে যাব মাঝিভাই, ছাড়বার দেরি কত?"

ঐটুকু ছেলের কথায় মাঝি সকৌতুকে বলে, "হাটুরে-নৌকোয় যাবে, কী সওদা নিয়ে যাচ্ছ দেখাও আগে।"

সহাস্যে অর্জুন সওদা দেখিয়ে দিল। সাধুচরণ। গঞ্জে যা বেচাকেনা হবে, তাকে সওদা বলা হয়। সাধুচরণ হেন সওদা দেখে মাঝি তো হেসেই খুন। অর্জুন তাড়াতাড়ি বলে, "আমার মোটকাদাদু, গায়ে-গতরে কিছু বেঢপ হলেও মস্ত বড় সাধু ইনি। গঞ্জের সেরা দোকান ওঁর ছেলের। যে ভাড়া দাবি করেন, তাই দেওয়া যাবে।"

মাঝি বলে, "আমাদের যে ভাই হাটুরে মাল ছাড়া অন্য কিছু বোঝাই দেবার নিয়ম নেই।"

অর্জুন কাতর হয়ে বলে, "বড্ড ঠেকে গেছি এই বুড়ো দাদুটিকে নিয়ে। পৌঁছে দিতেই হবে। বয়স হয়ে গেছে, আপনজনের মধ্যে গিয়ে থাকতে চান। ভাড়ার বাবদ আমি গতরে খাটব, ওঁর ভাড়া নগদ টাকায় আগাম দিয়ে দিচ্ছি। এক, দুই, তিন, চার। চার-চারটে এই পুরোপুরি রুপোর টাকা। এই দেখুন, আর আমার নেই, থাকলে তাও দিয়ে দিতাম। চারটে টাকা নিয়ে ক্ষমাঘেন্না করে ভাড়া শোধ করে নিন।"

ছেলেমানুষ এত কাকুতি-মিনতি করছে, দয়া হল চড়নদারদের। মাঝির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দেয়। অর্থাৎ, বেকায়দায় পড়েছে বুড়ো থুত্থুড়ে মানুষটাকে নিয়ে। উঠে পড়ুক। আর কী হবে।

ছাড়ল ডিঙি। অর্জুনের উপর বাঁধা হুকুম, যতক্ষণ সে ডিঙির উপর আছে, কলকের আগুন নিভতে দেবে না। অর্থাৎ, তামাক সেজে অনবরত চড়নদারদের মুখের সামনে ধরবে। কলকে নিভে গেলে তাকেও নেমে যেতে হবে তার ঐ মোটকা দাদুকে কাঁধে তুলে নিয়ে। অর্জুন ষোলো-আনা রাজি। ষোলো-আনা কেন, ষোলোর উপরে আঠারো-আনা।

চুক্তি হল, সবই হল, ডিঙিও ছুটল। কিন্তু দুটো বাঁক পার হতে না হতেই কোথায় বা কী! একসঙ্গে তিন কলকেয় আগুন দিয়ে অর্জুন একটা খোদ মাঝি-মশায়ের হাতে তুলে দিয়ে এল, একটা দিল কাড়ালের দিকে। এক টান দু-টান করে বোঠেওয়ালারা টেনে ছাড়ছে, আর তৃতীয় কলকে দিল মাঝবয়সী একজনকে, হরিদারোগা কিম্বা দারোগাভাই বলে ডাকছে তাকে সকলে। হরিদারোগা কিন্তু কলকে নিতে চায় না। বলে, "ভাঙা বোঠে কোত্থেকে এনে আমার হাতে তুলে দিয়েছে, দিয়ে তারাই দ্যাখো হাসাহাসি করছে এখন। মজা দেখছে। বোঠে ছেড়ে এখন যদি আমি কলকে ধরি, ওরা আমায় আস্ত রাখবে ভেবেছ?"

দারোগার গায়ে ঘামের স্রোত! কষ্ট হয়েছে খুব সন্দেহ নেই। অর্জুনও নাছোড়বান্দা। "ভাল তামাক, আমি আলাদা কায়দায় সেজেছি। দু'টান টেনে দ্যাখো, সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে। আরামে তুমি তামাক খাও, বোঠেও তোমার ঘুমোবে না দেখো, তোমার হয়ে কয়েকটা টান আমিই টেনে দিচ্ছি।"

অর্জুনের কথা শুনে চড়নদার একটি তো হেসেই খুন। "তুই বোঠে টানবি! বলিস কী রে ছোঁড়া! টানের মুখে বোঠে আটকে তুই নিজেই তো মুখ থুবড়ে জলে পড়বি। বাহাদুরিতে কাজ নেই, যা করছিস, করে যা। এখন তামাক সাজ, রাত্তির হলে ঘুমোবি ভুঁড়েলদাদুর ভুঁড়িতে মাথা রেখে। ছেলেমানুষ, আরাম করে ঘুমোস—কেউ কিছু বলতে যাবে না।"

কথা কানে না নিয়ে অর্জুন সাজা-কলকে হরিদারোগার হাতে তুলে দিল। বলে, "বড় যত্ন করে সেজেছি, টেনে বুঝবে। কেমন হয়েছে বলো আমায়।"

বলেই, হরির হাতের বোঠে যেন সে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। নিয়ে পা লম্বা করে দিয়ে প্রচণ্ড এক টান। এতগুলো বোঠে যাচ্ছে, কিন্তু অর্জুনের বোঠের টান একেবারে আলাদা। সবচেয়ে প্রচণ্ড। টানের গুঁতোয় ডিঙি মচর-মচর করছে। দেখাদেখি অন্যরাও মেতে উঠল। ডিঙি সাঁ-সাঁ করে ছুটেছে। গলুই থেকে মাঝি 'বাহবা, বাহবা' তারিফ করে উঠল। "ভ্যালা রে বাপ আমার! যতক্ষণ গতরে কুলোয়, চালিয়ে যা, বোঠে ছাড়বিনে, মুঠো নরম করবিনে। তামাক-সাজা কিম্বা আর

# ৩ বোরোলীন অলিম্পিক গল্পমালা

## বিজয়ী বীর

### ফ্যানটম ফিন

১৯২০ সালে এন্টওয়ার্পে অলিম্পিকের শুরুতেই ফিনল্যান্ডের পাভো নুরমী ১০,০০০ মিটার দৌড় ও 'ক্রস কান্ট্রি' দৌড়ে বিজয়ী হয়ে তাঁর দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। সময়ের সঙ্গে তাল রাখার জন্য তিনি স্টপ-ওয়াচ হাতে নিয়ে দৌড়তেন। তিনিই আবার ১৯২৪ সালে প্যারিসে মাত্র ২ ঘন্টার তফাতে ১,৫০০ ও ৫,০০০ মিটার দৌড়ে সোনা লাভ করেন।

### অদ্বিতীয় আওয়েন্স

১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে একটি নিগ্রো যুবক যাঁর নাম জেস আওয়েন্স, ১২টি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কোন না কোন বিশ্ব বা অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করেন বা ভাঙেন। এই অলিম্পিকে তিনি পান ৪টি সোনা। ভাবতে অবাক লাগে, তাই না?

### ফ্লাইং ফ্যানী

আরেকটি মনে রাখার মত ঘটনা ১৯৪৮-এর লন্ডন অলিম্পিক। ফ্রানসিনা ব্ল্যাঙ্কারস্-কোয়েন নামে এক ৩০ বছরের গৃহিণী ও সন্তানের জননী ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টে ৪টি সোনা জিতে সকলকে চমৎকৃত করেন।

### চেক্ এক্সপ্রেস

তোমরা চেক্ দৌড়বীর এমিল জেটোপেকের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনি ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে প্রথম ৩০ মিনিটের কম সময়ে ১০,০০০ মিটার অতিক্রম করেন। এছাড়াও এমিল হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ৫,০০০; ১০,০০০ মিটার এবং ম্যারাথন রেসে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেন। তাঁর স্ত্রী ডানাও জ্যাভেলিন থ্রোতে রেকর্ড করেন।

**বোরোলীন**

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

HTC-GDP-5420

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮

দশটা ফাই-ফরমাস আপাতত হরিদারোগাই করতে থাকুক। ঐ সব কাজ আসলে হরিরই. মউল-নৌকোয় যখন যায়, পুরোপুরি ঐ সমস্ত সে করে। একলা তাকেই ঐ সব করতে হয়। কানাকর্তার দরবার পার হয়ে যাই, তারপরে নাহয় হরির বোঠে হরিকে ছেড়ে দিস। তার আগে কখনো নয়। হরির বোঠে মারার ঢঙ্ দেখে আমার তো বাপু ভয় হয়ে গেছল।"

নিজ হাতের হালের বৈঠাতেও মাঝি প্রবল আলোড়ন লাগিয়েছে। আর সকলকে তাতিয়ে দিচ্ছে। "দরবারবাড়ির কানাকর্তামশায়কে কলা দেখিয়ে তারপরে থামাথামি। তামাক খাওয়া গল্পগুজব যত খুশি কোরো তখন।"

গোটা গ্রামের নাম রাজবাড়ি। আর দরবারবাড়ি হল ভদ্রানদীর তীরে খুব নাম-করা শৌখিন প্রাসাদ একটি। নৌকো থেকে দোতলা প্রাসাদের খানিক-খানিক দেখা যাচ্ছে। সত্যি, আহামরি বস্তু। কবিস্বভাবের সেকেলে কোনো রাজা বানিয়েছিলেন। একটা চোখ কানা ছিল তাঁর, লোকে আজও তাই কানারাজার বাড়ি বলে। কানারাজা বহুকাল লয় পেয়ে গেছেন, দরবারবাড়ি ভেঙেচুরে ইটের স্তূপ হয়েছিল। অনেককাল পরে বিস্তর হাত ঘুরে ইদানীং হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল কেশব চক্রবর্তীমশায় রাজবাড়ি গ্রাম, দরবারবাড়ি প্রাসাদ এবং যাবতীয় সম্পত্তির পত্তনিদার হয়েছেন। কয়েক লক্ষ টাকা খরচা করে দরবারবাড়ি নতুন করে গড়েছেন আবার, রংচং করেছেন। কিন্তু হলে হবে কী, অতবড় বাঘা উকিল হয়েও দরবারবাড়ি কবজায় আনতে পারছেন না। পুরনো কালের সেই কানাকর্তা অবধি এসে ঘোরতর মচ্ছব জমান দলবলসহ। নানা তল্লাটের আরও বিস্তর ভূতপেত্নি আসে। তবে সন্ধ্যা অতীত হয়ে যাবার পর, রাত্রিবেলা। দিনমানে কিছুই নয়। চারিদিক ফাঁকা, হা-হা করছে।

এই দরবারবাড়ি নিয়ে মাঝিদের যত আতঙ্ক। যাক, ফাঁড়া কেটেছে। দরবারবাড়ির দূরে তারা এখন। আর দুর্ভাবনা নেই। এবার বোঠে মারো ধীরেসুস্থে। গল্পগুজব করো যত খুশি। গুলতানি করো। রাতটুকু নৌকোয় কাটিয়ে কাল সন্ধ্যা নাগাত মধুগঞ্জে পৌঁছানো যাবে। হাটবার পরশু, সকাল থেকেই জমতে শুরু করবে।

শেষ ভাঁটায় হাটুরে-ডিঙি মন্থর গতিতে চলেছে। জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে নদীজল, নদীর এপার-ওপার। সাধুচরণের বড় আনন্দ—অনেক কাল পরে, একেবারে অন্তিম বয়সে আত্মজনদের কাছে চলেছেন। জীবনের বাকি দিনগুলো তাদের সঙ্গে কাটবে। দেশে-ঘরে তো এসে পড়েছেন এখন। কানাকর্তার দরবারবাড়ি পার হবার পর থেকেই সাধুচরণের মনে প্রবল স্ফূর্তি। ন্যাড়া অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে পালিয়েছিল, সাধুচরণ তাই খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। সে-ভাব সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে নতুন জীবন পেয়েছেন এখন যেন। ঘুমঘোরে আনন্দের চোটে নাক দিয়ে এক-একবার ব্যাঘ্রগর্জন ওঠে। খিলখিল করে হেসে অর্জুন মোটকা দাদুর নাক চেপে ধরে গর্জন বেরুনো বন্ধ করে দেয়। কাঁচা ঘুম ভেঙে সাধুচরণ খানিকক্ষণ অর্জুনের দিকে চোখ পিটপিট করেন। আবার ঘুমোন তিনি, আবার চলে নাকের গর্জন।

অর্জুনের ঘুম নেই এক লহমাও। হরিদারোগার সঙ্গে আচ্ছারকম জমিয়ে নিয়েছে। হরির হাতের বৈঠা ছিনিয়ে নিয়ে বেয়ে দিচ্ছে এক-বাঁক দুই-বাঁক। আর উৎকর্ণ হয়ে শুনছে বাদাবনের নানান আজব গল্প। বিশেষ করে মউলেদের গল্প, মৌচাক ভেঙে মধু-সংগ্রহ যাদের পেশা। হরিদারোগা অন্তত বিশবছর ধরে এই কাজে আছে। ভয়াল জঙ্গলের মধ্যে বাঘ-সাপ-কুমিরের পাশ কাটিয়ে দিব্যি এক মজার কাজ। বিপদ বেশি বলে মজাটাও বেশি।

হরি হল মউলের দারোগা। পুলিশ-দারোগা জানি—বুক দুরুদুরু করে তাদের পাকানো গোঁফ দেখে। মউলে-দারোগা হল একেবারে বিপরীত। জঙ্গলে নেমে জন্তু-জানোয়ারের, এমন কী একটা মৌমাছিরও মুখোমুখি হতে হয় না তাকে। সব মউলে নেমে পড়ে বাদায় ঢুকে যায়, একলা দারোগা নৌকোয় বসে মাল পাহারা দেয়। রাঁধাবাড়া করে রাখে মউলেদের জন্য। প্রতি মউলের জন্য তোলো-হাঁড়ি সাফসাফাই রাখে, মধু নিয়ে ফিরে এলে যার মধু তার হাঁড়িতে পরিপাটিরূপে ঢেলে রাখে। কাজ কঠিন নয়, কিন্তু দায়িত্বের কাজ।

হরিদারোগা নাছোড়বান্দা। বলে, "তোমাকেও আমি মউলে না করে ছাড়ব না ভাইটি। মধু কেটে আজকাল ভাল রোজগার, একবার গিয়েই রস পেয়ে যাবে। মধুগঞ্জে পৌঁছে গিয়েই ডিঙি বদলাব, হাটুরে-ডিঙি ছেড়ে মউলে-ডিঙি। আমি হলাম এক জাতমউলে। আরও কতশত আছে আমার মতো। মধুগঞ্জ মউলেদের বড় ঘাঁটি, নাম থেকেই মালুম। গিয়ে দেখতে পাবে, ঘাটে ঘাটে মউলে-নৌকোর ভিড়। এখন সব বনে ঢুকে যাবে, ফিরবে আবার মধুর ভরা নিয়ে। বেচাকেনার ভিড়টা দেখতে পাবে তখন।"

গল্পের পর গল্প। বাদাবনে এত রকমের কাজ আর এমন সব রকমারি গল্প। বাঘের শয়তানি থেকে মৌমাছির প্রতিহিংসা। গল্পে গল্পে পুবের আকাশে সূর্য দেখা দেবার গতিক। বোঠে অর্জুনের হাতে। হাতে বোঠে চালালে মুখের গল্পে দানা বাঁধে না, হরির বোঠে অর্জুন তাই ছিনিয়ে নিয়েছে। হাতে সে বোঠে মারছে, আর দু'কানে হরিদারোগার মজাদার গল্প শুনছে। চারিদিক ফরসা হয়ে গেল। অর্জুন বলে, "দ্যাখো, দ্যাখো দারোগাদা, থোকা-থোকা কালো শ্যাওলা সারবন্দী কেমন ভেসে যাচ্ছে।"

ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে হরি বলে, "শ্যাওলা নয়, আধ-পচা বেগুন। পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা ডুমুরের হাট ভাঙলে অন্তত বিশ ঝুড়ি বেগুন পোলের উপর থেকে গাঙের জলে ঢালছে, স্বচক্ষে দেখলাম। তারই কিছু এদিকে এসে পড়েছে। হাতের কাছে যে কটা পাও, তুলে ফেলো দেখি। আমাদের মউলেদের কাজে লাগবে।"

গল্পের গন্ধ পেয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠে অর্জুন, "কী রকম ? কী রকম ? কী কাজে লাগবে ? বেগুন জলে ঢালতে গেল কেন তারা ?"

"বেগুন-খেতে এবার অপর্যাপ্ত ফলেছে। দামে খুব শস্তা, দু'পয়সা চার-পয়সার বেশি কুড়ি নয়। সে কুড়িও আবার গোনাগুনতি কুড়িটা নয়। এক কুড়ির উপর পাঁচটা-সাতটা ফাউ। এত শস্তা জিনিসেরও খদ্দের নেই, হাট ভেঙে যায়, তখনও ঝুড়ি-ঝুড়ি পড়ে আছে। এই বোঝা আবার বাড়ি ফেরত নিয়ে যাবে ? বয়ে গেছে, বয়ে গেছে ! পুলের উপর দাঁড়িয়ে খেতল ঝুড়ি উপুড় করে ঢালল আমারই চোখের সামনে। বলল, 'চার ক্রোশ দূরে আমার বাড়ি, সেখান থেকে বোঝা বয়ে এনেছি, আবার তাই ফেরত বইতে হবে ?

মা-গঙ্গাকে দিয়ে গেলাম।' সেই বেগুনেরই দুটো-চারটে ভাসতে ভাসতে এদিকে এসে পড়েছে। যা পারো তুলে নাও অর্জুনভাই। মধু রাখতে হবে নতুন তোলো-হাঁড়িতে। হাঁড়ির তলায় বেগুনের বোঁটা ঘষে নিলে মধু বেশ ভাল থাকে।"

॥ ৩ ॥

মধুগঞ্জ অবশেষে। হাট লাগবে কাল সকাল থেকে। এখনই ঘাটে এমন ভিড় যে, নৌকো রাখার জায়গা পাওয়া দুষ্কর। সাধুচরণ অর্জুনের উপরে গদগদ। "তুমিই দাদা আমায় শেষ আশ্রয়ে এনে দিলে। এত কষ্ট অন্য কেউ করত না। ভাল হবে তোমার। ঈশ্বর মঙ্গল করবেন।"

অর্জুনের মনে তৃপ্তি। কাউকে কিছু করতে হল না। হাটবার না হলে মধুগঞ্জে লোক বেশি থাকে না। খবর অল্পেই ছড়িয়ে যায়। হাটুরে-নৌকো পৌঁছানোর সামান্য পরেই ভৃগুচরণ ছুটতে ছুটতে ঘাটে এল। সঙ্গে বড় ছেলে মণ্টু ও ছোট মেয়ে রানি। অর্জুনের পরোপকার ও সেবার কথা সাধুচরণ শত মুখে শোনাচ্ছেন। যে শোনে, সেই মুগ্ধ হয়ে যায়, আশীর্বাদ করে অর্জুনকে।

বাপকে ভৃগুচরণ দোকান-বাড়ি নিয়ে গেল। অর্জুনকেও ছাড়ল না, সে-ও থাকবে সেখানে যতদিন খুশি। অন্তত যতদিন না ভাল মউলে-নৌকো পাওয়া যাচ্ছে। ভৃগুচরণ বলে, "চাক কাটতে চাও, তা হরিদারোগার কতটুকু ক্ষমতা, সে কী করবে? অনেক মহাজনের টিকি আমার দোকানে বাঁধা। মধু ভেঙে এনে আমাকেই দেয়। আমারই টাকায় নৌকো ভাড়া করে বনে যাবে, ফিরে এসে আগাম দেওয়া টাকা শোধ করে দেবে।"

মউলে-নৌকো প্রথমখানার খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হয়ে গেল। করে দিল ভৃগুচরণই, বাপের কথায় ও অর্জুনের ধরাধরিতে। এবং ছোট ছেলে পিণ্টু ও ছোট্ট খুকি রানির আবদারের জন্যও বটে। ঘুষের লোভ দেখিয়েছে অর্জুন, বন থেকে ফেরার সময় ভাইবোনের জন্য মধু-ভরা মৌচাক আনবে, দেখে অবাক হয়ে যাবে তারা। হরিও যাচ্ছে এই দলের দারোগা হয়ে। এরও মূলে অর্জুন।

কারিগর মোটমাট বারো, তার উপরে দারোগা হরি। এবং আরও একটি—আমাদের শ্রীমান অর্জুন। অর্জুন কোনো বিশেষ কাজ নিল না। এই প্রথমবার গিয়ে শুধুমাত্র চাক কাটার ঘাঁতঘোঁত বুঝে আসবে। টাকাপয়সাও এমন কিছু দরকার নেই তার। কী করবে সে টাকা দিয়ে? খরচপত্রের গরজ না থাকলে টাকা তো বোঝাবিশেষ।

খড়কুটো যোগাড় করে মউলেরা তড়পা বানাতে লেগে গেছে। দেখতে যেন বেঁটেখাটো লাঠি। সেই জিনিস এক একটা কাঁধে তুলে নিল কারিগরেরা। সৈন্যদল যেন তলোয়ার নিয়ে যাচ্ছে। মিছে নয়, লাখ-লাখ মৌমাছির বিপক্ষে তড়পাই ওদের প্রধান সমরাস্ত্র।

ছয়জন করে দল। দু'দলে ভাগ হয়ে একদল ঢুকল দক্ষিণ দিককার বনে, আর দল পশ্চিমে। অর্জুনের তড়পা নেই, শূন্য হাতে যাচ্ছে। খুশিমতন যাচ্ছে সে। কখনও দক্ষিণে, কখনও বা পশ্চিমে। চোখ সকলেরই আকাশমুখো। উড়ন্ত মৌমাছি দেখছে। মৌমাছির ঝাঁক ডানদিকে গেল তো মউলেদের সবকটা মাথা ডাইনে। মৌমাছি বাঁয়ে ঘুরল তো মউলেদের মাথাও কলের পুতুলের মতন একসঙ্গে বাঁয়ে ঘুরে গেল। মাছিকে কক্ষনো এরা নজরছাড়া হতে দেবে না, তা অদৃষ্টে যা-ই ঘটুক। মাটির দিকে দেখছে না তো, হয়তো বা পানি-কাদায় আছাড় খেয়ে পড়ল, হয়তো বা শুলোর গুঁতো

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

খেয়ে পা ছিড়ে কেটে রক্তাক্ত হচ্ছে। হয়তো বা বাঘে অনুসরণ করছে, বাঘ ঘাড়ের উপর পড়ে টুঁটি কামড়ে নিয়ে চলল, মউলের তখনও নজর ঘুরিয়ে অবস্থাটা দেখে নেবার ফুরসত নেই।

কোন্ মাছির ঝাঁক হন্তদন্ত হয়ে ফুলে ফুলে মধু খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর কোন্ ঝাঁক মধু পেয়ে স্ফূর্তিতে এখন চাকে জমা দিতে চলেছে, মাছি ওড়ার ধরন দেখে মউলে সব বুঝে নেয়। মধু নিয়ে চাকে ফিরছে তো রক্ষে নেই, মউলেরা কিছুতেই রেহাই দেবে না। যত উঁচু গাছ আর যত ঘন ডালপালাই থাকুক, তার ভিতরের মৌচাক ঠিক তারা বের করে ফেলবে। 'তড়পা' এইবারে খুব কাজে আসে। আগুন দিয়েছে তড়পার মুখে, তাতে আগুন হল সামান্য, ভলকে ভলকে ধোঁয়াই বেরুচ্ছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক। মাছি কিন্তু ভয় পেয়ে যায়—আগুন লেগে তাদের চাক বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবার, যার মধ্যে এত কষ্টের মধুর সঞ্চয় রয়েছে। চাক রক্ষার জন্য মাছিরা চতুর্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডালপালার ভিতরে চাকের ঠিক-ঠিক জায়গাটা মউলেদের এতক্ষণ সুস্পষ্ট জানা ছিল না—এবারে সর্বনাশের মুখে মৌমাছিরাই তা জানিয়ে দিল। উত্তাপে প্রাণ দিল কতক মৌমাছি, পালাল কিছু। চাক এখন প্রায় মাছিশূন্য। নির্বিঘ্নে চাক কেটে গাছতলায় আনল। আহা রে, মধু নয়, যেন মুক্তো, চাকের মধ্যে টলমল করছে।

নৌকোয় চাক চালান করে দিল হরিদারোগার হেপাজতে। যা করবার, এরপর সে-ই করবে। কারিগরের দল নতুন চাকের সন্ধানে নতুন একদিকে দৌড়ল যথারীতি আকাশমুখো তাকিয়ে।

দরকারে কাঠবিড়ালির মতো সুড়সুড় করে বড় বড় গাছের মাথায় উঠে যাবে। পরমুহূর্তেই হয়তো বা সড়াক করে নেমে পড়বে। সমস্তটা দিন ধরে এই নিয়মে চলে।

বাদাবনে বিপদ পায়ে পায়ে। বাঘ সাপ হাঙর কুমির ইত্যাদি বড়রা তো সর্বক্ষণই সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন: চেহারায় অতি তুচ্ছ ও সামান্য হলেও প্রতিহিংসা নেওয়ার ব্যাপারে মৌমাছিরাও একরত্তি কম যায় না। মৌমাছির মধ্যে সব চেয়ে দুর্ধর্ষ হল, সূর্যমুখী নামে যে চাক, তার বাসিন্দারা। বিষম বদরাগী এইসব মাছি, বড় দুঃসাহসী। মউলে দেখলেই হাজারে হাজারে গিয়ে আক্রমণ করবে। হুলের কী সাংঘাতিক জ্বলুনি। মউলের গা-হাত-পা ফুলিয়ে মুহূর্তে চেহারা ভিন্ন রকম করে দেয়। প্রাণে বাঁচবার আশায় মউলে তখন গাঙ খাল বিল যেটা সামনে পায়, ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কুমির-কামটের ভয় থাকে না তখন। ডুব দিয়ে জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে রাখে। কিন্তু কতক্ষণ! দম আটকে অসহ্য হয়ে আবার যেই মুখ তুলতে গেছে, উঁহু, আবার ডুব। মাছিদের রাগ একটুকুও কমেনি। যেখান থেকে মানুষটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এতক্ষণ ঠিক সেইখানেই সূর্যমুখী মাছিরা দলবদ্ধ হয়ে চক্কোর দিয়ে ফিরছে। কতক্ষণ থাকবে কে জানে? ডুব দিয়ে এবারে মউলে সারা গায়ে আচ্ছা করে নোনা কাদা মাখল দেওয়ালে চুনকাম করার কায়দায়। তবু রেহাই হয় না।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, বিপদ অল্পসল্প, মারাত্মক তেমন কিছু নয়। তিন দিনের দিন কিন্তু সাংঘাতিক। বাঘ পিছু নিয়েছে তাদের। মউলেরা যথারীতি উড়ন্ত মৌমাছির পিছনে দৌড়চ্ছে, আর দক্ষিণ-দলের কাছাকাছি চলেছে এক বাঘ, অতি সন্তর্পণে, বেশ খানিকটা দূরে-দূরে। গোড়ায় কেউ দেখতে পায়নি, দেখেছে শুধু বানর, গাছের ডালে বানরের নাচানাচি। বানর হল বাঘের জাতশত্রু, কিন্তু অপর জন্তু-জানোয়ারের পরম বন্ধু। গতিক বুঝে যত বানর এই তল্লাটের গাছে গাছে এসে জুটেছে, দুড়দাড় করে লাফাচ্ছে এ-ডাল থেকে ও-ডালে, ক্যাঁ-ক্যাঁ করে শোরগোল তুলেছে দস্তুরমতো। বনের কোনো জন্তুর এর পরে অবস্থা বুঝতে বাকি থাকে না: সামাল, সামাল, বাঘ পিছু নিয়েছে!

তোলপাড় পড়ে গেল চতুর্দিকে। যে যেখানে যে-কাজে ছিল কাজ ফেলে রে-রে করে দৌড়ল। কিন্তু বাঘ কোথা! চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেছে, বাঘ একেবারে নিপাত্তা। এক কাঠুরে নিজ চোখে দেখেছে, লাফ দিয়ে বাঘ বেশ

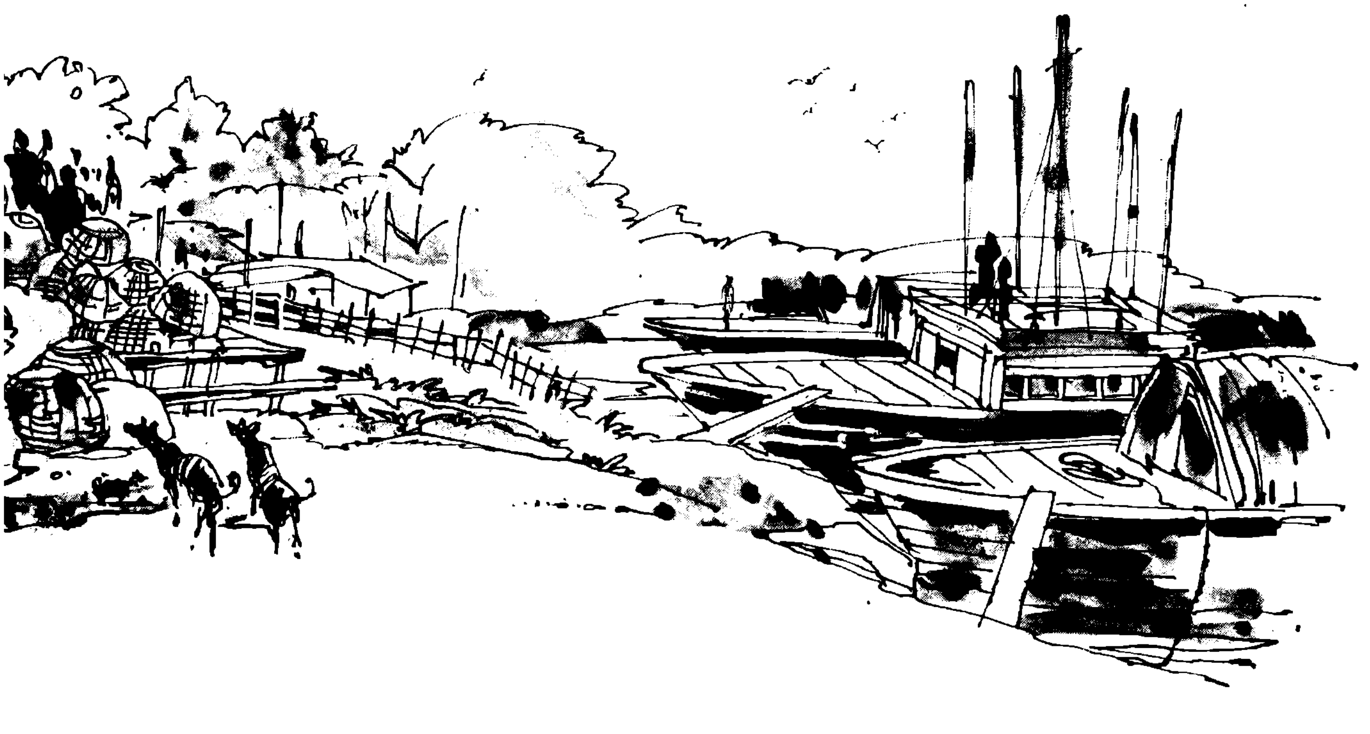

খানিকটা উঁচু হয়ে এক মউলের ঘাড়ে পড়ল। স্পষ্ট দেখেছে সে, মা-বনবিবির দিব্যি করে বলছে। অথচ, যেন ম্যাজিক, কোনোদিকে কোথাও বাঘের আর নিশানা নেই। যেন পাখনা মেলে উড়ে পালিয়েছে।

অর্জুন টিপিটিপি হাসছিল। তারপর এত মানুষের জমায়েত আর শোরগোল করে বাঘ খোঁজাখুঁজিতে সে আর চেপে থাকতে পারল না, হো-হো করে উদ্দাম হাসি হেসে উঠল। বলে, "এই যে তিনি। কিন্তু বাঘ কে বলবে, ডুরেকাপড়-পরা ফুটফুটে কনেবউটি। পালকির অভাবে আমার এই থলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে, বেহারা বিহনে আমারই কাঁধে চেপে চলেছেন। বউ দেখবেন তো থলির মুখ একটু আলগা করে দিচ্ছি, নতুন বউয়ের মুখ এক এক নজর সবাই দেখে নিতে পারেন।"

থলির মধ্যে আটক হয়ে বাঘ এখন একটুকু মেনিবিড়ালের মতো। বাঘ দেখিয়ে দিয়ে আর কোনো কথাবার্তা নেই—হন হন করে অর্জুন আর এক দিকে চলল।

সর্দার-কারিগর জিজ্ঞাসা করে, "চললে কোথা ? আমাদের সঙ্গে যাবে না ?"

অর্জুন ঘাড় নাড়ল। "না, শখ মিটেছে। খেপে গিয়ে মৌমাছিরা সময় সময় হুল বসায় বটে, তা হলে-ও বলব, খুব সাচ্চা শ্রমিক তারা। সারা দিনমান তারা তিলেক বিশ্রাম নেয় না, এ-ফুল সে-ফুল খুঁজে খুঁজে এক-ফোঁটা দু'ফোঁটা করে মধু এনে জমায়। তাদের মধুভাণ্ডারে ডাকাতি করতে মনে বড্ড লাগে আমার। মউলের এই কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

নামিয়ে-আনা চাকের একটুকরো গামছায় বেঁধে, বাঘের থলি পিঠের উপর ফেলে অর্জুন হন-হন করে চলল।

মউলে-সর্দার বলল, "তা এক্ষুনি চললে কোথা ? এই যাত্রাটা অন্তত থেকে যাও। মধুগঞ্জে ফিরে গিয়ে মধুর ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়ে তারপরে যেখানে খুশি যেও।"

অর্জুন বলে, "যাচ্ছি মধুগঞ্জেই। তোমরা কাজ করে যাও, আমি একলহমাও আর এর মধ্যে নেই। তোমাদের সঙ্গে এই ক'দিন ঘুরেছি, তার জন্য এক পয়সাও চাইনে। বাঘটুকু নিয়ে এসেছি ভৃগুদার ছেলে মণ্টুর জন্য। আর চাক রানি খুকুর, চুষে চুষে মধু খাবে সে। তাদের কথা দিয়ে এসেছিলাম।"

॥ ৪ ॥

ভর সন্ধ্যা। হেঁটে হেঁটে অর্জুন ক্লান্ত। এক বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াল। মধ্যবয়সী টেকো মানুষটি ভুঁড়ি আলগা করে হুঁকো টানছিলেন। অর্জুন জোড়হাতে জিজ্ঞেস করল, "গোমস্তা—হুজুরের বাড়ি তো এই ? হুজুরই বোধ হচ্ছেন সেই তিনি।"

"কোথা থেকে আসছ তুমি ছোকরা ?"

"গাঙের ধারে 'কানাকর্তার দরবার', আপাতত সেখান থেকে। তার আগে মালঞ্চের জঙ্গলে মধু কাটার কাজে ছিলাম কিছু দিন। ভাল লাগল না—মউলের কাজে ইস্তফা দিয়ে দল ছেড়ে চলে এসেছি।"

গোমস্তা বললেন, "ইস্তফা দিলে কেন বাপু ? মধুর কাজ তো বেশ ভাল। ভাল রোজগার হয়।"

অর্জুন বলে, "অন্যায় রোজগার আমার গরপছন্দ। ভেবে দেখুন, সারা দিন ধরে সর্ব তল্লাটে ঢুঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা মধু সঞ্চয় করল।—আমরা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব মধু ডাকাতি করে আনি। অন্যায় নয় বলুন হুজুর।"

বার বার 'হুজুর হুজুর' করছে, গোমস্তা একেবারে গলে যাচ্ছেন। ছোকরা বিনয়ী বটে ! গোমস্তা শুধালেন, "তা এদিকে চলেছ কোথা ?"

"এখানেই, হুজুরের কাছে। 'কানাকর্তার দরবার' নামের যে বাড়ি দেখে এলাম, শুনলাম তার ষোলআনা কর্তা এখন আপনিই।"

প্রবল ঘাড় নেড়ে গোমস্তা বলেন, "ভুল শুনেছ—একেবারে ডাহা মিথ্যা। বর্তমান মালিক হলেন মহামহিম কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী এম এ, বি এল মহাশয়, মোকাম মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট।"

অর্জুন নাছোড়বান্দা হয়ে বলে, "কাগজপত্রে যা-ই হোক, আপনিই আসল আমি নানা সূত্রে জেনে এসেছি। অনেক আশা করে বিস্তর কষ্টে এসেছি, আমায় বঞ্চিত করবেন না।" বলে সে গোমস্তার পা জড়িয়ে ধরতে যায়। তিড়িং করে লাফিয়ে হাত দুয়েক পিছিয়ে গিয়ে গোমস্তা বলেন, "কী চাও তুমি, খুলে বলো।"

অর্জুন বলে, "আসার পথে বিকালবেলা কর্তার দরবার আরও একটা পাক দিয়ে এসেছি। আহামরি বাড়িখানা। এ-বাড়ি কলকাতা শহরের কান কেটে দেয়। ঐ বাড়িতে একটা রাত্রি বাস করে যাব, যদি অনুমতি দান করেন। সকালে উঠেই রওনা দেব। যদি আদেশ করেন কাকপক্ষীকেও জানতে দেব না আমার এই রাত কাটানোর কথা।"

গোমস্তা হো-হো করে উচ্চ হাসি হাসেন। "সে কী কথা, জানতে না দেবার কী হল ? আমরাই তো ঢাকঢোল পিটিয়ে জানান দেব, যদি সকালবেলা কাল বহাল তবিয়তে বেরিয়ে আসতে পারো। সঙ্গে সঙ্গে নগদে পাঁচ-পাঁচটা টাকা পারিতোষিক, উকিলবাবুর আদেশ। সেকেলে এক পুরনো বাড়ি লাখ লাখ টাকা খরচা করে নতুন চেহারায় গড়ে তুললেন। অথচ একটা রাতও বসবাস করতে পারলেন না, এত টাকা এবং চেষ্টা পরিশ্রম ন দেবায় ন ধর্মায় গেল, এর জন্য কি কম দুঃখ আমাদের মনে ? বাঘা উকিলের বক্তৃতার দাপটে এজলাসের সাহেব সুবোরা পর্যন্ত কেঁচো হয়ে যান, কিন্তু ভূতেরা গ্রাহ্য করে না। দরবারবাড়িতে সত্যি সত্যি যদি রাত কাটাতে চাও, এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু চুক্তিপত্র লিখে দিতে হবে : তোমার জীবনহানি কিংবা কোনোপ্রকার বিপদ-আপদের জন্য আমরা বিন্দুমাত্র দায়ী হব না।"

আবার বলেন, "দাও লিখে যেমন যেমন বলি। তারপর সই মেরে দিয়ে আমাদের খরচায় একপেট খেয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ঢুকে যাও দরবারবাড়ি। ভাল খাট-পালঙ্ক উত্তম বিছানাপত্র—নাকে বাঘ ডাকিয়ে এক ঘুমে রাত কাবার করতে পারবে,—শোওয়ামাত্র, যদি না বিচ্ছুগুলো এসে ভুতুড়ে নাচ জুড়ে দেয়।"

অর্জুন সগর্বে ছড়ার সুরে বলল—

*ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি,*
*বাঘ ধরে থলিতে পুরি, ভূতে করবে কী ?*

গোমস্তা বলেন, "বেলা ডুবু-ডুবু। এক্ষুনি যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, চলে যাও অকুস্থলে।"

কথাবার্তার মধ্যে পড়শি কয়েকটি এসে দাঁড়িয়েছে।

একজনে বলল, "পাঁচ টাকা পারিতোষিক কিন্তু বড্ড কম গোমস্তামশায়। রেট আপনাদের বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।"

গোমস্তা সহাস্যে বলে, "কত চাই ? পঁচিশ ? পঞ্চাশ ? পাঁচশো ? কোনো আপত্তি নেই। টাকা দেব তো রাত পোহানোর পরে। নিশ্চিত জানি, কিছুই দিতে হবে না। বয়সে ছেলেমানুষ এরা, মুখে লম্বা লম্বা কথা বলতে কোনো অসুবিধা তো নেই!"

অর্জুন বিরক্ত হয়ে বলে, "হাঁটা-পথে বড্ড পরিশ্রম হয়েছে, ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে আমার। এমন ভাল দালান-কোটায় শুতে পাব, টাকা মোটে না-পেলেই বা কী ? খাবার-টাবার কী দেবেন, তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন। নাকে মুখে গুঁজে একছুটে দরবারবাড়ি গিয়ে পড়ি গে। বিছানা-টিছানা আছে শুনেছি, না থাকলে-ই বা কী! মেঝের উপর রাত কাটিয়ে দেব।"

গোমস্তা বলেন, "কিছু নিতে হবে না ছোকরা। ভিতরে গিয়ে বুঝবে; শৌখিন মানুষের কত সাধের বাড়ি। ঘরে ঘরে সাজানো খাট-পালঙ্ক, বিছানা-বালিশ-মশারি। দিনের বেলা হলে আমি নিজে সঙ্গে থেকে সব দেখিয়ে দিতাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, আমরা কেউ আর ওখানে ঢুকতে পারব না। একলা গিয়ে দেখেশুনে নাও গে, আমরা আশেপাশেই থাকব।"

ঢুকে গেল অর্জুন।

"ভালয় ভালয় ফেরো কাল সকালে—তখনই বোঝা যাবে কত বড় সাহস আর শক্তি ধরো তুমি।"—পড়শি সবাই বলাবলি করছে। বাড়ির ধারে ওঝা-বদ্যিও এনে মোতায়েন করেছেন গোমস্তামশায়। সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে, দরবারবাড়ির ভিতর থেকে কোনোরকম আওয়াজ আসে কিনা।

যা ভাবা গিয়েছে, ঠিক তাই। দুড়ুম-দাড়াম আওয়াজ ভিতরে। যেন গজকচ্ছপের লড়াই ছোকরাকে তালগোল পাকিয়ে এক্ষুনি বুঝি বাইরে ছুঁড়ে দেবে। আগেও কতজনাকে দিয়েছে এমনি।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, অনতিপরেই একেবারে চুপচাপ। রাত ঝিমঝিম করছে। তালগোল পাকিয়ে অর্জুনকে ছুঁড়ে দিল না—। অত্যধিক ডেঁপো বলে সম্ভবত গলা টিপে শেষ করে দিয়েছে। যত যাই হোক, বাড়ির মধ্যে ঢুকে রাত্রিবেলা কিছু করবার সাধ্য নেই। অন্ধকার থাকতেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাওয়া—এত তাগত কারো হবে না। রাত পোহালে তখন এসে খোঁজ করে দেখা যাবে। যা দেখবে, সে অবস্থা ভালমতোই জানা। অনেকের ক্ষেত্রে দেখেছে, এবারও দেখবে।

বাতি হাতে অর্জুন ঘরে ঢুকল। ঢুকেই শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই ঘুম। ঘুমের মধ্যে মনে হচ্ছে সুড়সুড়ি দিচ্ছে কারা তার গায়ে। চুল টানছে, কান টানছে। পা ধরে টানাটানি করছে।

'এই-এইও' বলে তাড়া দিল অর্জুন ঘুমজড়িত কণ্ঠে। কেউ গ্রাহ্য করে না, একটানে তখন মাথার বালিশ সরিয়ে নিল। তাতেও অর্জুনের দৃক্‌পাত নেই। শোবার সময় মাথার বালিশ কদিনই বা পেয়ে থাকে ?

"বড্ড উৎপাত আরম্ভ করেছিস তোরা। মানা করছি, তা কানে যায় না বুঝি ?"

ভূতেরা এবার করল কী, খাটের মাথা ধরে ঘুমন্ত মানুষসুদ্ধ খাড়া করে তুলল। এমনি অবস্থায় শোওয়া যায় না, দুড়ুম করে মেঝেয় পড়ে গেল।

অর্জুন রেগেমেগে বলে, "ভাল কথায় হবে না দেখছি। আঙুল না বাঁকালে ঘি ওঠে না। ভাল কথা বললাম, বড্ড ধকল গেছে আমার, শান্তিতে একটু ঘুমোতে দে। তা কিছুতেই যখন শুনবিনে, ব্রহ্মাস্ত্র ধরি তা হলে।"

বলে, সে ছড়া পড়ল :

*খুলেছি সন্ন্যাসীর থলে,*
*ঢুকে যা সব দলে দলে!*

ছড়া শেষ হতে না হতে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অর্জুন স্পষ্ট বুঝতে পারছে কী কতকগুলো পোকা থলির মধ্যে ঢুকে গেল।

খলখল করে হাসে অর্জুন। বলে, "দেখলি তো এবার ? ক্ষমতা বোঝ তা হলে।"

থলির মুখে দড়ি ঝুলছে, দড়ি দিয়ে কষে মুখ বেঁধে অর্জুন বলে, "একেবারে চুপচাপ থাকবি, একবিন্দু বজ্জাতি করবি নে। ঘুমোব আমি। তোরাও পড়ে পড়ে ঘুমো। সকালবেলা তা

হলে ছেড়ে দেব ।”

বলে, নিশ্চিন্তে অর্জুন ভসর-ভসর করে গভীর ঘুম ঘুমোতে লাগল । এক ঘুমেই রাত প্রায় কাবার । উষাকালে, আকাশ তখনও চারিদিক ভাল করে পরিষ্কার হয়নি, ভূত বেচারাগুলোর জন্য কষ্ট হচ্ছে অর্জুনের । এগুলো ছেলেমানুষ ভূত—থলির ভিতরের ছটফটানি দেখে মালুম হচ্ছে । অর্জুন বলল, “যা, ছেড়ে দিচ্ছি এবার । কাউকে আর কখনো জ্বালাতন করতে যাবিনে । ভূতের স্বভাব-দোষ সেটা জানি, কিন্তু পাড়ার মধ্যে ভুতুড়ে কাণ্ড-মাণ্ড একদম চলবে না । অভ্যাস যদি ছাড়তে না পারিস, পাড়া ছেড়ে শ্মশানে কি গোরস্থানে চলে যা, যা তোদের চিরকালের জায়গা । ভুতুড়ে কাণ্ড-মাণ্ড করগে সেখানে গিয়ে, কিছু বলতে যাব না আমরা । আপন ঘাঁটি ছেড়ে মানুষের জায়গায় কেন এসে চেপে থাকিস তোরা—নানান রকমের বজ্জাতি করিস ? এবারে পেলে আর তোদের আস্ত রাখব না, হুঁশ থাকে যেন ।”

সকাল হল । দরবারবাড়ির সামনেটায় বেশ খানিকটা ভিড় । গোমস্তামশায় অগ্রবর্তী হয়ে বললেন, “বাইরের ছেলে হয়েও আমাদের মধ্যে এসে তুমি এতবড় ঝুঁকি নিয়েছিলে, বড্ড উদ্বেগ ছিল তোমায় নিয়ে । দু'চোখ এক করতে পারিনি সারারাত্রির মধ্যে । কিন্তু তুমি তো ভালই ছিলে, বোঝা যাচ্ছে ।”

নিরুত্তরে অর্জুন কাঁধের থলে মাটিতে নামিয়ে মুখ খুলে দিল । ভিড়ের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে মুখ খুলে অর্জুন ছড়া পড়ছে :

*আদুড় গায়ে বাদুড় যায়,*
*থলি থেকে সব বেরিয়ে আয়—*

যেই না বলা, শোঁ-শোঁ-শোঁ একরকম অদ্ভুত আওয়াজ উঠল থলির ভিতরে । তারপর পরমাশ্চর্য ব্যাপার—থলির মুখ দিয়ে চামচিকে জাতীয় একপ্রকার জীব ঝাঁকে-ঝাঁকে বেরুতে লাগল । আকাশ অন্ধকার হবার উপক্রম । বাচ্চা-ভূতেরা বেরিয়ে অর্জুনকে ঘিরে পুরো একটা চক্কর দেয় । তার পায়ের কাছে মাথা নামায় একবার । তারপর উড়ে উড়ে নানান দিকে পালিয়ে যায় । আকাশ এখন স্বচ্ছ ও সুন্দর ।

এতক্ষণে হাসিমুখে অর্জুন বলল, “দরবারবাড়িতে স্রেফ ভূত-পেত্নির দরবার, এ সমস্ত আপনাদের ভয়-দেখানো বানানো গল্প—আরামে রাত কাটিয়ে আমি হদ্দমুদ্দ বুঝে এসেছি । বলুন, তাই কিনা ? ভিতরের কথা ভাঙুন ।”

আবার বলে, “গোড়ায় কিছু চামচিকে-আরশুলারা গায়ে পড়ে মুখে পড়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল । বেয়াদবি দেখে রাগ হয়ে গেল আমার । উঠে তখন থলিতে ভরে ফেললাম । থলির ভিতরে কিচিরমিচির কান্নাকাটি—বললাম, একটুও শব্দ করবি নে, খবরদার । ভোর অবধি চুপচাপ পড়ে থাক । আমার ঘুমের একটুও যেন অসুবিধা না হয় । রাত পুইয়ে গেলে আমার পায়ের গোড়ায় নাকে খত দিবি, আর উড়ে পালাবি । চুক্তিটা ছিল এই । তাই দেখলেন না, আমার পায়ে মাথায় এক-এক ঠোক্কর দিয়ে ভক্তি জানিয়ে পালাতে লাগল ।”

রোদ উঠে গিয়ে বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে । গোমস্তামশায় অর্জুনের সর্বাঙ্গ ঠাহর করে দেখে বলেন, “তোমার গায়ে দেখছি আঁচড়টুকুও লাগেনি । অবাক কাণ্ড ।”

অর্জুন ভালমানুষের মতো বলে, “কী জানি, কী সব বলছেন আপনারা । ভূত না ঘোড়ার-ডিম । সবই ভাল ওখানে । চমৎকার ঘরবাড়ি, খাসা খাট-বিছানা, ঘুমানোর ভারী মজা । এত সুখের ঘুম জীবনে আমি কমই ঘুমিয়েছি ।”

গোমস্তা প্রস্তাব করেন, “বলছিলাম, কী বাবাজীবন, আজকের রাতটাও তোমায় ঘুমোতে হবে ওখানে । একলা নয়—আরও দুজনকে দিচ্ছি তোমার সঙ্গে । পারিতোষিক পাঁচ নয়, দশ নয়, থোক পঁচিশ ।”

অর্জুন প্রবল ঘাড় নাড়ল । “না-না-না । টাকার লোভ দেখাবেন না আমায় । আর লোকও চাইনে আমার সঙ্গে । কাল তো একলাই ছিলাম, বেশ ছিলাম । কোনো অসুবিধা হয়নি ।”

“তোমার জন্য নয় গো, বাবাজি । এই যে দুজন, এরা আমাদের বরকন্দাজ, ওদের সাহস বাড়বে তোমার সঙ্গে রাত কাটিয়ে এলে, সেই ভরসায় পাঠাচ্ছি । বাবু আমাদের মবলগ খরচা করেছেন দরবারবাড়ির জন্য । নিজেরা ভোগ করবেন বলেই । বাড়ি এইরকম ভূতের কবলে বিসর্জন দেবার জন্য নয় ।”

হেসে অর্জুন বলে, “কাল যা কাটিয়েছি, অত আরামে শোওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা । আমার জীবনে অমন কমই ঘটেছে । দুটো দিন কেন, দরকারে আমি ঢালাও দশ দিনও থেকে যেতে পারি ।”

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যা আসন্ন । আজকেও আবার দরবারবাড়িতে শুতে চলেছে । যাচ্ছে তিনজন । অর্জুন সকলের আগে, একফোঁটা বালক হয়েও দলের দলপতি সে । কাছারির বরকন্দাজ ষণ্ডা ও গুণ্ডা অর্জুনের পিছন পিছন যাচ্ছে । ষণ্ডার হাতে লোহা-বাঁধানো পাঁচহাতি লাঠি, গুণ্ডার কাঁধে শালকাঠের প্রকাণ্ড মুগুর । মুগুর-চালনায় গুণ্ডার নাকি জুড়ি নেই দিগরের মধ্যে ।

আসার মুখে গোমস্তামশায় এদের আচ্ছারকম খাইয়ে দিয়েছেন । রকমারি খাদ্য পেয়ে এরাও নিদারুণ রকম সেঁটেছে । শোওয়ারও অতি উত্তম ব্যবস্থা—কালকের চেয়েও ভাল । তিন তিনখানা গদিআঁটা পালঙ্ক পাশাপাশি । এ-হেন পালঙ্কের উপর বাপের জন্মে শোয়নি তারা কেউ । অর্জুনের তো শুতে না শুতেই ঘুম । ষণ্ডা-গুণ্ডা এপাশ-ওপাশ করে ।

ঝুলন্ত লণ্ঠনের জোরালো আলো সারা ঘর দিনমান করে ফেলেছে।

হঠাৎ দেখা গেল, কোথাও কিছু নেই, দরজার কাছে এক-খাবলা ঘন অন্ধকার। সে অন্ধকার এমন ঘন যে, মনে হয় বর্শা মারলে বিঁধে যাবে। অন্ধকার ক্রমশ বড় হতে লাগল। বড় হয়ে হয়ে সমস্ত ঘর যেন গ্রাস করে ফেলল। আলোটা দপদপ করতে লাগল হঠাৎ। নিভে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কোনো অদৃশ্য পুরুষ দুই বরকন্দাজের গলা টিপে ধরে বিছানা থেকে উঁচু করে তুলল। তুলতে তুলতে একেবারে ঘরের ছাত অবধি তুলে ফেলেছে—ছাতের কড়িবরগা মাথায় ঠেকছে। মুখ দিয়ে ষণ্ডা-গুণ্ডার কথা বেরুচ্ছে না গলা টেপার চোটে। গাঁ-গাঁ-গাঁ উৎকট আওয়াজ বেরুচ্ছে।

আওয়াজে অর্জুনের ঘুম ভেঙে গেল। কী, কী ব্যাপার! ভূত ষণ্ডা-গুণ্ডার গলা ছেড়ে দিল। পড়ল তারা খাটের গদিতে নয়, দুম করে কঠিন মেজেয়। হাড়গোড় চুরমার হয়ে গেছে মনে হল। নাকিসুরে এক ভূত বলল, "ন্যাড়া-বটতলার মহাশ্মশানে কাল রাত্রিবেলা সারা গাঁয়ের সমস্ত কর্তাভূত জমায়েত হয়েছিল। সেই সব জরুরি কথাবার্তার মধ্যে বাচ্ছারা ছিল না। বাবুর এই বাগানবাড়িতে এসে তারা সব লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি করছিল। কায়দায় পেয়ে তোরা সেইসব কচিকাঁচাগুলোকে সারারাত থলির মধ্যে আটকে রেখে নাক ডেকে ঘুমিয়েছিস। আজ তার শোধ তুলব।"

অর্জুন বলে, "তা ষণ্ডা-গুণ্ডার উপর আক্রোশ কেন? ওরা মোটে আসেইনি কাল। যত যা কিছু আমি একাই করেছি। ক্ষমতা থাকে, আমার উপরে শোধ তোলো।"

সর্দার-ভূত হাত ছয়েক লম্বা একখানা হাত বাড়িয়ে অর্জুনের কান ধরতে গেল। আর অর্জুন অমনি থলির মুখ খুলে দিয়ে বিড়বিড় করে ছড়া পড়ল। ভূতমশায় তক্ষুনি টিকটিকির মতো পাকিয়ে গোলাকার হয়ে টুক করে থলির মধ্যে ঢুকে গেল। মুখ বেঁধে ফেলল অর্জুন। দেশলাই জ্বেলে নিভনো লণ্ঠন আবার জ্বেলে দিল। ঘরে আবার যেন দিনমান। ষণ্ডা-গুণ্ডাকে অর্জুন বলে, "তোমাদের মুগুর-লাঠি কই?"

"লাঠি-মুগুর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে ছিটকে পড়ল, ঠাওর পাইনি।"

অর্জুন বলল, "ঘরের মধ্যেই আছে, যাবে কোথায়? খাটের নীচে কি আর কোথাও গড়িয়ে পড়েছে। বের করো।"

পাওয়া গেল লাঠি। এবং মুগুরও। অর্জুন বলে, "পেটাও এইবারে। দমাদম পেটাও থলির উপর। কর্তা-ভূতদের আস্পর্ধা বড় বেশি, উচিত শিক্ষা দিয়ে দাও।"

গদি বানানোর সময় ধুনুরিরা যেমন তুলো পেটায়, দুই বরকন্দাজ তেমনি থলি পেটাতে আরম্ভ করল। ষণ্ডা-গুণ্ডাকে ভূতেরা বিস্তর নাজেহাল করেছে, তারই এবার শোধ তুলবে। ভূতমশায়রা বস্তাবন্দি—করবার কিছু নেই তাদের। বস্তার উপর প্রচণ্ড বিক্রমে মুগুর ও লাঠি পড়ছে। থলি দুই পায়ে খেঁতলাচ্ছে বরকন্দাজ দুজনে। থলির উপরে উদ্দাম নৃত্য করছে। থলির ভিতরে কুঁই-কুঁই, বিড়ালছানার মতো অসহায় আর্ত ধ্বনি। দরজার উপরে এইসময় আরও কতকগুলো ছায়া। অর্জুন চট করে থলির মুখ সামান্য আলগা করে বলে, "তোমরাই বা বাইরে বাইরে কেন? চলে এসো।" বলে, আর একবার ছড়া পড়ল। সুড়ুত-সুড়ুত করে আরও কতকগুলো ঢুকে গেল। থলির মুখ বন্ধ করে দিয়ে আবার পিটুনি। তুমুল আর্তনাদ। অর্জুন অবশেষে ষণ্ডা-গুণ্ডাকে ইঙ্গিতে থামতে বলল। বলে, "আসবি আর কখনও তোরা দরবারবাড়ি?"

"আজ্ঞে না।"

"কান মল, নাক মল্।"

চেষ্টা খানিকটা করে থাকবে, থলির ভিতরে নড়াচড়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখা গেল। তারপর সকাতরে ভূতেরা বলে, "হয় না। হাতই নাড়ানো যাচ্ছে না ভিতরে। কী করব?"

"আচ্ছা, ছাড় করে দিচ্ছি, বেরিয়ে আয়। মনে থাকে যেন, কোনোদিন এ-বাড়ির, এই পাড়ার ত্রিসীমানায় কেউ আসবিনে। দলের মধ্যে ভাল করে বুঝিয়ে দিবি, এখানে এলে খোয়ারটা কী-রকম!"

থলির মুখ খুলে দিয়ে অর্জুন বেরিয়ে আসার ছড়াটুকু পড়ল। একের পর এক বেরিয়ে আসছে ভূত। ঠেঙানি খেয়ে দেহে আর তাদের তাগত নেই—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার উপর অর্জুনের হুকুম-মতো নাকে খত্ দিতে দিতে বাড়ির বার হতে হচ্ছে, উঠোনটা সম্পূর্ণ পার হয়ে গিয়ে তবে বাঁচোয়া। আর কদাপি নয়, এই ভূতজন্ম থাকতে, মনে-মনে সব ভূতের এই প্রতিজ্ঞা। হানাবাড়ি কদাপি আর নয়, দরবারবাড়ি এখন থেকে সত্যি-সত্যি।

ভূত তাড়িয়ে সকালবেলা তিনজনে বেরিয়ে এল। বিজয়ীর গৌরবযাত্রা। বাইরে অপেক্ষমাণ রীতিমত এক জনতা। ভূতের সঙ্গে লড়াইয়ের বৃত্তান্ত সবাই সবিস্তারে শুনতে চায়। ষণ্ডা-গুণ্ডা শতকণ্ঠে অর্জুনের সাহস ও বীরত্বের কথা বলছে। ভূতের দুর্গতিতে ছেলেবুড়ো সবাই হেসে খুন।

লোকের হাজারগণ্ডা ফরমাশ। কেউ বলে, আমার বাগানে ভূত নয়, পেত্নি একটা আস্তানা পেড়েছে। রাত্রি বারোটা বাজলে শ্যাওড়াগাছে উঠে নাকিসুরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। শুয়ে শুয়ে পাড়ার তাবৎ মানুষ শোনে। জ্যোৎস্নারাত্রে দুঃসাহসী কেউ কেউ বাগের কাছাকাছি গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, ফর্সা রঙের বউ একটি শ্যাওড়াগাছে পা ঝুলিয়ে বসে আকুল কান্না কাঁদছে। পেত্নির কান্না ভারী অলক্ষুনে। ভাই অর্জুন, একরাত্রে ওটাকে তুমি গ্রামছাড়া করে দিয়ে এসো। তুমি ভিন্ন আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে না।

এক বৃদ্ধ বলেন," আমার উঠোনের বেলগাছটায় সন্ধ্যা থেকে এক ব্রহ্মদৈত্যের ওঠানামা। দীর্ঘদেহ, খালি পা, গলায় সুপুষ্ট পৈতের গোছা, খড়ম পায়ে খটখট করে চারিদিকে ঘুরে বেড়ান। আমায় দেখলেই সুড়সুড় করে ডাল বেয়ে গাছের মাথায় উঠে পড়েন। চোখ পিটপিট করেন, উঁকিঝুঁকি দেন, আবার পাতালতার ফাঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। এই ব্রহ্মদৈত্যমশায়কে গ্রামছাড়া করে দাও বাবা। তুমিই পারবে।"

অর্জুন বলল, "আমি ওঝা নই। ভূত-পেত্নি ব্রহ্মদৈত্য তাড়ানো আমার পেশা নয়। দরবারবাড়ি অন্তত একটা রাত কাটাব, আমার বড় লোভ ছিল। গোমস্তামশায় ব্যবস্থা করে দিলেন। সেইজন্য তাঁর অনুরোধটা রেখেছি। তা বলে আমি এইসব নিয়ে থাকব না। বাদাবন দেখার ইচ্ছে। যতদূর পারি বনের মধ্যে ঘুরতে চাই। গাছপালা দেখব, বনের পশুপাখি দেখব, ফুল দেখব। আপনারা এ বিষয়ে যদি সাহায্য করতে পারেন, আমার মনের ইচ্ছা-পূরণ হবে, ব্যস্।"

# ভয় দেখানোর গল্প

রানা দাস

আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ভারী অদ্ভুত—বীভৎসু। আমরা সকলে তাকে 'বীভৎস' বলে খেপাতাম। বীভৎসু অবশ্য এতে বিশেষ বিরক্ত হত না। হাসত। এরকম অদ্ভুত নামের জন্যে তার কোনো লজ্জা বা দুঃখও ছিল না। বরং বেশ খানিকটা গর্ব করেই সে বলত, "জানিস, অর্জুনের আরেক নাম বীভৎসু!"

হবেও বা!

একবার আমরা সহপাঠীরা সকলে মিলে চণ্ডীগড় বেড়াতে গেলাম। ট্রেনে চড়ে। অভিভাবক হিসেবে আমাদের সঙ্গে গেলেন ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ বসাক। কলকাতা থেকে চণ্ডীগড় বেশ লম্বা পথ। এতটা পথ শুধু তো আর শুয়ে বসে খেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায় না। তার ওপর আবার দল বেঁধে যাচ্ছি। একা হলে না-হয় বই পড়ে কিংবা জানালায় চোখ রেখে ছুটন্ত গাছপালা, সবজিখেত, জলা-টিলা দেখেই অনেকটা সময় পার করে দেওয়া যেত। সে উপায় যখন নেই, তখন আমাদের মধ্যে কেউ গান ধরল, কেউ একের পর এক করে যেতে লাগল আবৃত্তি, কেউ বা আবার ক্যারিকেচার প্যান্টোমাইম ইত্যাদি করে খুব হাসাতে লাগল মেয়েদের।

এরই মধ্যে কী করে জানি না একসময় ভূতের প্রসঙ্গ চলে এল। রীতিমত গা-ছমছম-করা ভূতের গল্পও শোনা গেল কয়েকটা। দেখা গেল, এ-ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেউ ভূত দেখেছে, আবার কেউ কেউ ভূত না-দেখলেও কোনো-না-কোনো সময় ভূতের ভয় পেয়েছে।

ব্যতিক্রম একজন। সেই বীভৎসু।

জীবনে সে নাকি কখনও ভূত দেখা তো দূরে থাক, ভূতের ভয় পর্যন্ত পায়নি। বেশ জোরগলায় বলতে লাগল সে, বিজ্ঞানের এই যুগে ভূত বিশ্বাস করার কোনো মানেই হয় না। দু-একজন বীভৎসুর এই কথা সমর্থন করল বটে, কিন্তু তাদের সমর্থনে তেমন জোর ছিল না। কথায়-কথায় বীভৎসু একসময় বলে বসল, একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরাই নাকি ভূত দেখে বা ভূতের ভয় পায়!

অর্থাৎ ওর মতে, আমরা সকলেই কম-বেশি কাণ্ডজ্ঞানহীন!

বীভৎসুর মুখে এমন একটি মন্তব্য শোনার পর কারো মেজাজই আর ঠিক রইল না। এই অবস্থায় ভূতের অস্তিত্ব রক্ষায় আমরা সকলে মিলে একমাত্র প্রতিপক্ষ বীভৎসুর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলাম। ভূত নিয়ে যারা গালগল্প লেখে, তাদের কথা না-হয় ছেড়েই দিচ্ছি। সে-সব পড়লেই বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের অনেক নামকরা জ্ঞানী গুণী শিল্পী সাহিত্যিক ভূত প্রসঙ্গে তাঁদের নিজেদের জীবনের চমৎকার যে-সব কাহিনী লিখেছেন, সেগুলিকে নস্যাৎ করি কী ভাবে! আমরা সে-সমস্ত গল্প মনে করে, মনে করার চেষ্টা করে বীভৎসুকে জব্দ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম একের পর এক। বীভৎসু কিন্তু কিছুতেই দমে না, সে শুধু বলে, ভয়ের মধ্যেই ভূতের উৎস!

এইভাবেই একসময় আমরা চণ্ডীগড় পৌঁছে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই ভূতের প্রতি বীভৎসুর মমতা আদায় করতে পারা গেল না।

মনে মনে কেমন খেপে উঠলাম আমরা, যেমন করেই হোক, বীভৎসুকে ভূত বিশ্বাস করাতে হবে। ভূত সত্যি সত্যি থাক বা না থাক, বীভৎসুকে অন্তত একটা ভূত দেখাতেই হবে। ব্যাপারটা এখন আর ভূতের অস্তিত্ব রক্ষা নয় শুধু, আমাদেরও প্রেস্টিজ রক্ষার দায় হয়ে পড়েছে।

চণ্ডীগড়ে আমরা উঠেছিলাম সেখানকার পঞ্চায়েত ভবনের লম্বা-চওড়া এক ডরমেটরিতে। বেশ বড় এবং উঁচু বাড়ি। আমরা ছিলাম তার পাঁচতলায়। সেখানে মালপত্র গোছগাছ করে খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে বেশ রাত হল। সকলেই ক্লান্ত। তাই আর গল্প-গুজব না করে ডরমেটরির ক্যাম্পখাটে যে যার মতো শুয়ে পড়ল চটপট। আর বলা বাহুল্য, শুয়ে পড়া মাত্রই ঘুম।

ঘুম ছিল না কেবল আমাদের কয়েকজনের চোখে, যারা ভূতের প্রতি অবিশ্বাসী বীভৎসুর বেয়াড়াপনায় রীতিমত মর্মাহত! বীভৎসুকে ভূত না-দেখানো পর্যন্ত আমাদের চোখে

ঘুম তো দূরে থাক, মনে কোনো স্বস্তি আসা সম্ভব নয়।

তাই সকলে ঘুমিয়ে পড়লেও আমরা কয়েকজন একত্র হয়ে বীভৎসুকে কী করে ভূত দেখানো যায়, সে-ব্যাপারে গভীর পরামর্শ শুরু করলাম। বড় ঘরটার কোনো আলোই তখন জ্বালানো নেই। কাচের জানালা টপকে শুধু একফালি জ্যোৎস্না ঘরটার অন্ধকারকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

আমাদের মধ্যে একজন বলল, "বীভৎসুকে ভূত দেখাতে হলে আগে ওকে জাগাতে হবে, কিন্তু ও তো এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন!"

আমি বললাম, "এতেই আমাদের সুবিধে। বীভৎসুকে যে আজ ভূত দেখাতে পারবই, সে সম্পর্কে আমরা এখনও তেমন নিশ্চিত নই। কিন্তু চেষ্টা করলে ভূত দেখাবার পথে ওকে কিছুটা এগিয়ে দিতে পারি আমরা, আর তার জন্যে এখন ওর গভীর ঘুমটাই দরকার।"

এই কথায় সকলে ভারী উৎসুক হয়ে আমাকে ঘিরে ধরল, "ব্যাপারটা কী রকম?"

আমি আমার প্ল্যানটা খুব চাপা স্বরে ওদেরকে জানালাম। ডরমেটরির যে খাটগুলো আমাদের শোবার জন্যে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অ্যালুমিনিয়ামের তাই তেমন ভারী নয়। আমরা চারজন খুব সাবধানে বীভৎসুকে খাটসুদ্ধ তুলে ঘরের বাইরে খোলা বারান্দায় রেখে দেব। তারপর মাঝরাত্রে যখন ওর ঘুম ভাঙবে তখন ভূত ওকে দর্শন দেবে কি দেবে না সেটা ভূতের ব্যাপার; কিন্তু নিজেকে ঘরের বাইরে ঐভাবে আবিষ্কার করলে ও নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। তখন দেখব ওর কাণ্ডজ্ঞান কতটা ঠিক থাকে!

এই কথা শুনে সকলেই প্রায় চিৎকার করে আমার বুদ্ধির তারিফ করতে যাচ্ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে জিভে একটা হালকা শব্দ তুলে ওদেরকে সাবধান করে দিলাম।

গুটিগুটি পায়ে বীভৎসুর খাটের পাশে গিয়ে দেখি এই মুহূর্তে ওর জেগে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবু পাছে হঠাৎ জেগে উঠে ও আমাদের চিনে ফেলে, তাই আমরা আমাদের বিছানার ধবধবে সাদা চাদরগুলো দিয়ে নিজেদের চোখমুখ আর মাথায় বেশ ভাল করে জড়িয়ে নিলাম।

এরপর খুব সাবধানে বীভৎসুর খাটটা তুলে নিলাম আমাদের কাঁধে। ডরমেটরির দরজাটা হাট করে খুলেই রেখেছিলাম। মড়ার খাটিয়া মানুষ যেভাবে নিয়ে যায়, আমরা তেমনি ঘুমন্ত বীভৎসুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তবে পা টিপে-টিপে। বীভৎসু তখন চাদরমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

বাইরেটা তখন বেশ ঠাণ্ডা। বাতাসের সঙ্গে সম্ভবত কিছু হিম ভেসে বেড়াচ্ছে। জ্যোৎস্নার রঙটা তেমন স্বচ্ছ নয়, একটু ঘোলাটে। বারান্দার একপাশে সারি সারি দরজাগুলো সবই বন্ধ, অন্যপাশে নিস্তব্ধ নিথর আকাশ হঠাৎই যেন খুব কাছে নেমে এসেছে। বারান্দার মেঝেয় ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নার আলোয় বরফির মতো খণ্ড খণ্ড করেছে গ্রিলের ছায়া। আলো-আঁধারির ছোট বড় সেই বরফিগুলো পেরিয়ে আমরা বারান্দার প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছি, আচমকা বীভৎসু নড়েচড়ে উঠল! এইরকম মাঝপথেই যে ও জেগে উঠবে, এটা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি, তাই একটু বেসামাল হয়ে পড়লাম। বীভৎসু ইতিমধ্যে চলন্ত খাটে বসে কিছু ঠাহর করতে না-পেরে চাপা অথচ সত্যি সত্যি বীভৎস গলায় 'গোস্ট গোস্ট' বলে চেঁচিয়ে উঠল!

সেই চিৎকারে কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম আমরাই। এ তো বীভৎসুর গলা নয়, অধ্যাপক ডঃ বসাকের গলা!

রহস্যটা টের পাওয়া গেল পরদিন সকালে। ব্রেকফাস্ট-টেবিলে বীভৎসু বলল, "তোরা যে আমাকে ভয় দেখাবি, সেটা বুঝে বসাক-স্যারের সঙ্গে আমি বিছানা পালটে নিয়েছিলাম।"

বসাক-স্যার অবশ্য আমাদের বকেননি। শুধু বলেছিলেন, "বড্ড ছেলেমানুষ তোমরা!"

---

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

গাবলু
"ভাল একটা ইঁদুর-কল বানালেও লোকজনেরা তোমার দরজায় এসে ভিড় জমাবে।" — ইমার্সন
"আর খারাপ ইঁদুর-কল বানালে ভিড় জমাবে ইঁদুরেরা।" — গাবলু

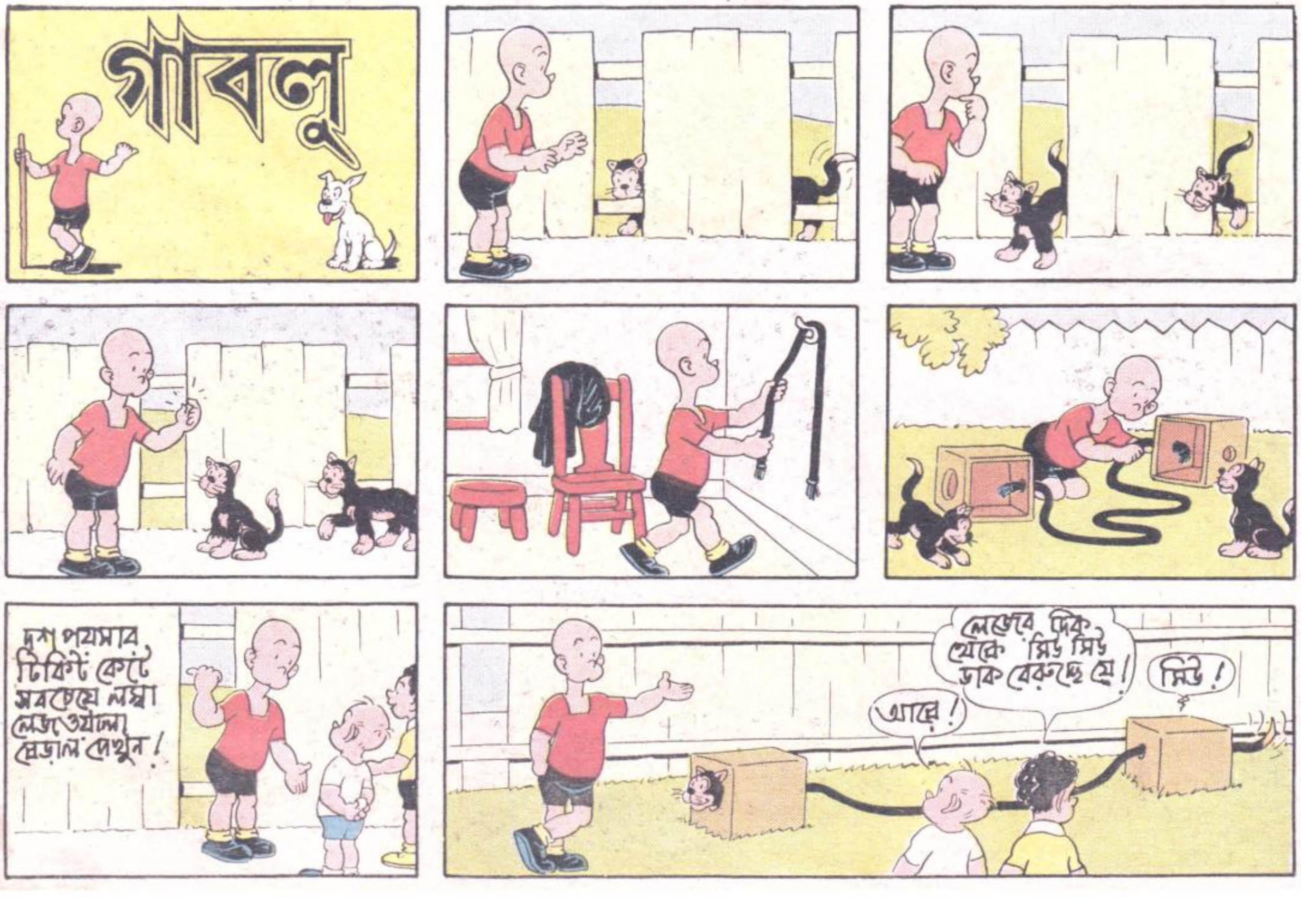
গাবলু
দশ পয়সার টিকিট কেটে সবচেয়ে লম্বা লেজওয়ালা বেড়াল দেখুন!
আরে!
লেজের দিক থেকে মিউ মিউ ডাক বেরুচ্ছে যে!
মিউ!

## ওই পুকুরে

বাড়ির পাশে ওই পুকুরে
একঝাঁক পাতিহাঁস
কাটছে সাঁতার আপন মনে
পুকুরের চারিপাশ
চিকচিক রোদের ছায়া
করছে ঝিলমিল
আকাশেতে ডানা নেড়ে
নাচছে শঙ্খচিল

জ্যোৎস্না দে (বয়স ৭)

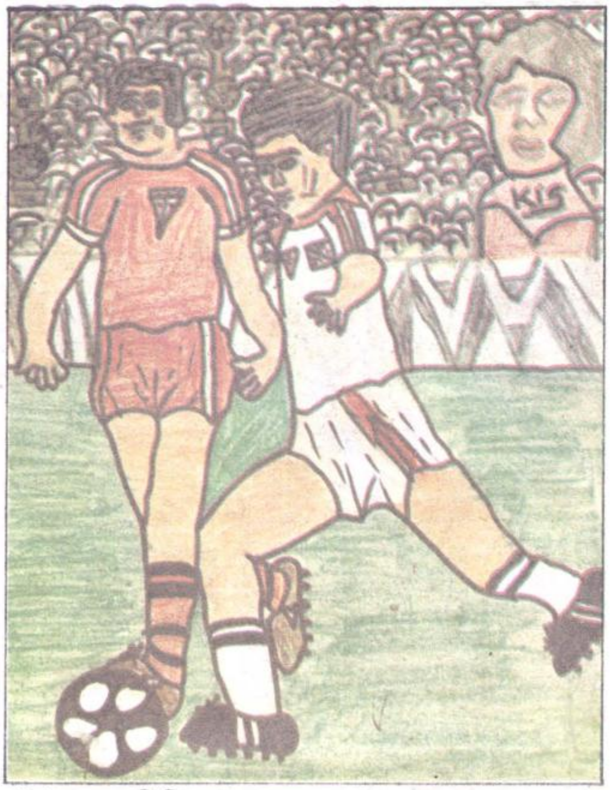

ছবি এঁকেছে **অভিজিৎ দাস** (বয়স ১১)

ছবি এঁকেছে **সায়ন মজুমদার** (বয়স ১১)

## হারাধন

হাজরা মোড়ের হারাধন
বজরা চড়ে সারাক্ষণ
মৎস্য ধরেন জমজমাট
বৎসসহ বাবুঘাট
**সৌমেন দেবনাথ** (বয়স ১৫)

## কেঁদো বাঘের কী হবে ?

সুন্দরবনে এক কেঁদো বাঘ ছিল। গায়ে তার ডোরা দাগ। বাঘটার সেদিন পেট ভর্তি ছিল, তবু খাবারের লোভে বনের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে একজন শিকারি তীর-ধনুক হাতে শিকার খুঁজছিল। হঠাৎ একটা গাছের তলায় দুজনের দেখা।

বাঘটা হালুম করে। শিকারি তীর-ধনুক তাক করে। তারপর বাঘটা বিরাট হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়তেই শিকারি সাঁই করে তীরটা হাঁয়ের ভিতরে ছুঁড়ল। অমনি বাঘটা আঁ-আঁ করে লাফাতে লাগল।

বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাবা, বাঘটা বেঁচে যাবে ?"

বাবা বললেন, "ডাক্তার ডাকো, বলে দেবে।"

পাশ থেকে হঠাৎ আমার দুষ্টু ভাই নেকো বলে উঠল, "কেন লে দাদা। বাঘটা তো পাজি। আমাল লড্‌টা দিয়ে মাথায় এমন মালব না—পট্ কলে মলে যাবে।"

**গৈরিক বসু** (বয়স ৬)

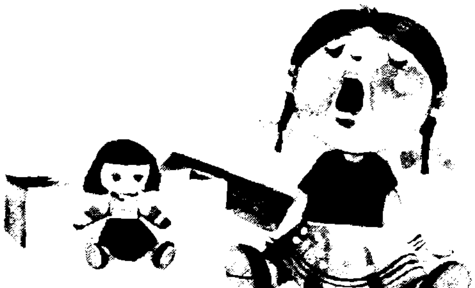

## খুকুর পুতুল

কিনল খুকু একটি পুতুল
নাম দিল তার মিষ্টি তুতুল
তুতুল কেন কয় না কথা
খুকুর মনে ভীষণ ব্যথা
পড়াশোনায় নেইকো মন
কাঁদে কেবল সারাক্ষণ
খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়ে
বসে থাকে পুতুল নিয়ে
মায়ের কাছে বায়না করে
সারাটা দিন আঁচল ধরে
এমন পুতুল দাও না কিনে
কইবে কথা আমার সনে
**দেবাশিস বসু** (বয়স ১৬)

## জলখাবার

উনুন ভরা আগুন
পড়ল তাতে বেগুন
নুন-লঙ্কা নে
পেঁয়াজকুচি দে
চামচ-দুয়েক তেল
করে নে মিশেল
সবটা মেখে নিয়ে
জমবে মুড়ি দিয়ে
**রাজর্ষি রায়** (বয়স ৯)

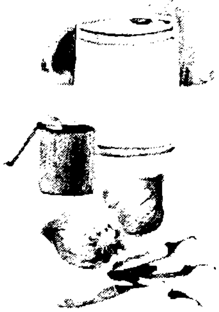

## নাক-ডাকার রেকর্ড

আমার ভাই রাজু খুব দুষ্টু। তখন আমাদের বাড়িতে আমার জেঠু ছিলেন। দুপুরবেলায় জেঠু যখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিলেন, তখন আমার ভাই টেপ-রেকর্ডার নিয়ে তাঁর নাক-ডাকার শব্দ তুলে নিয়েছিল।

জেঠু ঘুম থেকে উঠলে আমার ভাই সেটা তাঁকে বাজিয়ে শোনাল। তিনি খুব রেগে গেলেন।

তারপর থেকে ভাইকে যখনই জেঠু বকতে যান তখনই ভাই বলে, "বকলেই তোমার নাক-ডাকা সবাইকে শুনিয়ে দেব।"

জেঠু তাই শুনে ভয়ে চুপ করে যান।

**কাকলি মুখোপাধ্যায়** (বয়স ১৩)

# শার্লক হোমসের গল্প

সার আর্থার কোনান ডয়েল

## বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি

আজকাল শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার বড় দেখাশোনা হয় না। সংসারের নানান ঝামেলা, তার ওপর ডাক্তারি প্র্যাকটিসের চাপ। আমার দম ফেলবার ফুরসত নেই। আর হোমসও খুব ঘরকুনো লোক। বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাওয়া তার ধাতে নেই। বেকার স্ট্রিটের বাসায় নিজের বই-পত্তরের মধ্যে ডুবে থাকতেই সে ভালবাসে। যদিও তার জীবনের লক্ষ্য হল অপরাধের হেস্তনেস্ত করে অপরাধীকে ধরা। এই কাজের প্রয়োজন ছাড়া সে ঘর থেকে মোটেই বের হতে চায় না। হোমসের ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আর খুবই তুচ্ছ সূত্র ধরে বেশ জটিল রহস্যের সমাধান করে ফেলবার কায়দা লণ্ডনের বিশাল পুলিশবাহিনীকে মাঝে-মাঝে রীতিমত চমকে দেয়। আর পাঁচজনের মতোই আমিও এখন শার্লক হোমসের কীর্তি-কাহিনীর সংবাদ পাই খবরের কাগজের মারফত। একদিন দেখলুম যে, ট্রেপফ খুনের কিনারা করতে হোমস ওডেসায় গেছে। কিছুদিন পরে আবার দেখলুম যে, হোমস ট্রিনকোমালি গেছে অ্যাটকিনসন ভাইদের রহস্য সমাধান করতে। আর এই সেদিন দেখলুম যে, ইংল্যাণ্ড রাজবংশের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ অথচ একান্ত গোপনীয় একটা ব্যাপারের সুচারু সমাধান করেছে হোমস।

একদিন রাত্তিরে—সঠিক তারিখটা হল ২০ মার্চ ১৮৮৮—আমি রুগি দেখতে গিয়েছিলুম। রুগি দেখে বাড়ি ফেরবার সময় হঠাৎ খেয়াল হল যে আমি বেকার স্ট্রিট ধরে হাঁটছি। পুরনো বাসার দরজার কাছে এসে আমার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলুম একবার শার্লক হোমসের খবরাখবর নেওয়া যাক। কেমন আছে? কী করছে? রাস্তা থেকে আমি দেখতে পেলুম তার ঘরে বেশ জোরালো আলো জ্বলছে। নজরে পড়ল, তার রোগা লম্বা শরীরের ছায়া বার-দুয়েক জানালার কাঁচে পড়েই সরে গেল। বুঝলুম হোমস ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। শার্লক হোমসকে আমি যত ভালভাবে চিনি তত ভালভাবে তাকে আর কেউ চেনে না। তার ঐ ভাবে বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে দু হাত রেখে ঘরের ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি করা দেখেই আমি বুঝতে পারলুম যে, নতুন কোনো তদন্তের ভার হাতে নিয়ে সেই রহস্যের নেশায় সে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। আমি দরজার বেল টিপলুম আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরনো ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

যদিও আমাকে দেখে হোমস বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখাল না তবুও আমি বুঝলুম যে, আমার আসায় সে খুবই খুশি হয়েছে। একটা চেয়ার টেনে বসতেই হোমস আমার দিকে সিগারের বাক্সটা এগিয়ে দিলে। আমি একটা সিগার ধরালুম। তারপর সে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফায়ার প্লেসের আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, "ওয়াটসন, তুমি এখন দিব্যি আরামে আছ দেখছি। যা ছিলে তার চেয়ে অনেক মোটা হয়েছ! ওজন কত বাড়ল? সাড়ে সাত পাউণ্ড তো হবেই—"

"সাত পাউণ্ড," আমি জবাব দিলুম।

"না; আমার মনে হচ্ছে আর একটু বেশি হবে। দেখছি তুমি পুরোদমে প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছ। প্র্যাকটিস করবার মতলব কিন্তু তুমি আমার কাছে কখনও বলোনি।"

"তাহলে তুমি জানলে কী করে," আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম।

"আমি দেখতে জানি তাই জানতে পারি। আচ্ছা বলো তো দু-তিন দিন আগে তুমি বৃষ্টিতে খুব ভিজেছিলে কিনা? আর তোমার ঘরের কাজ করার লোকটি যেমন অলস তেমনি ফাঁকিবাজ কিনা?"

"হোমস," আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, "এটা তোমার ভয়ানক রকম বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তুমি যদি আজ থেকে দু-তিনশো বছর আগে জন্মাতে তো লোকে তোমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত। তুমি ঠিকই বলেছ, গত বৃহস্পতিবার আমাকে একটু পল্লী অঞ্চলে যেতে হয়েছিল আর আমি যাকে বলে কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম। কিন্তু আমার আজকের পোশাক দেখে সে কথা তুমি জানলে কী করে? আর ঘরের কাজের মেয়েটির কথা যদি বলো তো তাকে এই মাস গেলেই ছাড়িয়ে দেব ঠিক করেছি। কিন্তু তার কাণ্ডও তো তোমার জানবার কথা নয়।"

হোমস খুশিতে হাত ঘষতে ঘষতে নিজের মনে হাসতে লাগল।

"আরে এ তো জলের মতো সোজা। তোমার বাঁ পায়ের জুতোর যেখানটায় ফায়ারপ্লেসের আগুনের আভা পড়েছে সেখানটায় দেখছি চামড়ার ওপর পর পর ছটা লম্বা আঁচড় টানা। বোঝাই যায় যে, অত্যন্ত যাতা করে দায়সারাভাবে কেউ শক্ত কোনো কিছু দিয়ে জুতোয় লেগে থাকা শুকনো কাদা তুলতে চেষ্টা করেছে। আর এর থেকে আমি দুটো সিদ্ধান্ত করলুম। এক, তুমি ঝড়জলে ভিজেছিলে। আর তোমার কাজের লোকটি লণ্ডন শহরের প্রধান অকর্মাদের একজন।

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

**লিরিল**

তরতাজা হ'বার সাবান

**লেবুর মত চনমনে তরতাজা**

LINTAS-LR-27-2416 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আর তুমি যে ডাক্তারি করছ তার প্রমাণ পেলুম তুমি ঘরে পা দিতেই। যদি কোনো লোক ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে আইডোফর্মের গন্ধে ঘর ভরে যায়, যদি তার ডান হাতের তর্জনীতে সিলভার নাইট্রেটের কালো দাগ লেগে থাকে আর তার মাথার লম্বা টুপির একদিকটা স্টেথিসকোপ গুঁজে রাখার জন্যে ফুলে থাকে আর এই সব দেখেও আমি যদি বুঝতে না পারি যে, সে একজন রুগিদেখা ডাক্তার তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, আমার মতো মাথা-মোটা লোক লণ্ডন শহরে আর দুটি নেই।"

হোমসের কথা শুনে আমি না হেসে পারলুম না।

"দেখো হোমস, তুমি যখন সব ব্যাপার বেশ করে বুঝিয়ে বলো তখন মনে হয় এসব তো জলের মতো সহজ। এটা তো আমারও বলতে পারা উচিত ছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই তোমার কথা শুনে কেমন বোকা বনে যাই। অথচ ভগবান আমাকে তো তোমারই মতন এক জোড়া চোখ দিয়েছেন।"

"ঠিক কথা।" মৌজ করে পাইপ ধরাতে ধরাতে হোমস উত্তর দিলে, "আসলে তোমরা সব-কিছুই চোখ দিয়ে ওপর ওপর দেখ, মন দিয়ে গভীরভাবে দেখ না। যেমন ধরো আমাদের একতলা থেকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে তুমি কতবার ওঠানামা করেছ।"

"অসংখ্যবার।"

"তবু?"

"কয়েক শো বার তো হবেই।"

"ভাল কথা। বলো তো সিঁড়িতে কটা ধাপ আছে?"

"কটা ধাপ আছে? মানে . . . মানে . . . ।"

"দেখলে তো। তার মানে তুমি ভাল করে দেখনি। আমি দেখেছি। ঠিক সতেরোটা ধাপ আছে। যাক গে। তুমি আমার ছোটখাটো রহস্য সমাধানের উৎসাহী সহকারী আর লেখক বলে তোমার এটা দেখা দরকার," এই বলে হোমস টেবিল থেকে একটা খোলা চিঠি তুলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। "চিঠিটা আজ বিকেলের ডাকে এসেছে।"

চিঠিটায় না আছে তারিখ না আছে লেখকের নাম বা ঠিকানা।

চিঠিটা এইরকম: "আজ রাত্তিরে পৌনে আটটা নাগাদ এক ভদ্রলোক বিশেষ গুরুতর একটি সমস্যার সমাধানের জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। কিছুদিন আগে ইউরোপের কোনো রাজবংশের সুনাম বজায় রাখতে আপনি যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তার থেকে আমরা বুঝেছি যে, এই ধরনের গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনাকে স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায়। আপনার এই দক্ষতার কথা শুনেছি আমরা অনেক জায়গা থেকে। ঐ সময়ে অবশ্যই বাড়ি থাকবেন। আর আগন্তুক যদি মুখোশ পরে থাকেন তো কিছু মনে করবেন না।"

চিঠিটা পড়ে আমি বললুম, "এ তো দেখছি রীতিমত রহস্য। রহস্যটা কী ধরনের কিছু অনুমান করতে পেরেছ নাকি?

"আমার হাতে কোনো তথ্য নেই। আর তথ্য ছাড়া সিদ্ধান্ত করাটা মহা ভুল। তাতে হয় কি, তথ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত না করে তথ্যগুলোকে আমরা মনগড়া সিদ্ধান্তের মতো করে নিতে

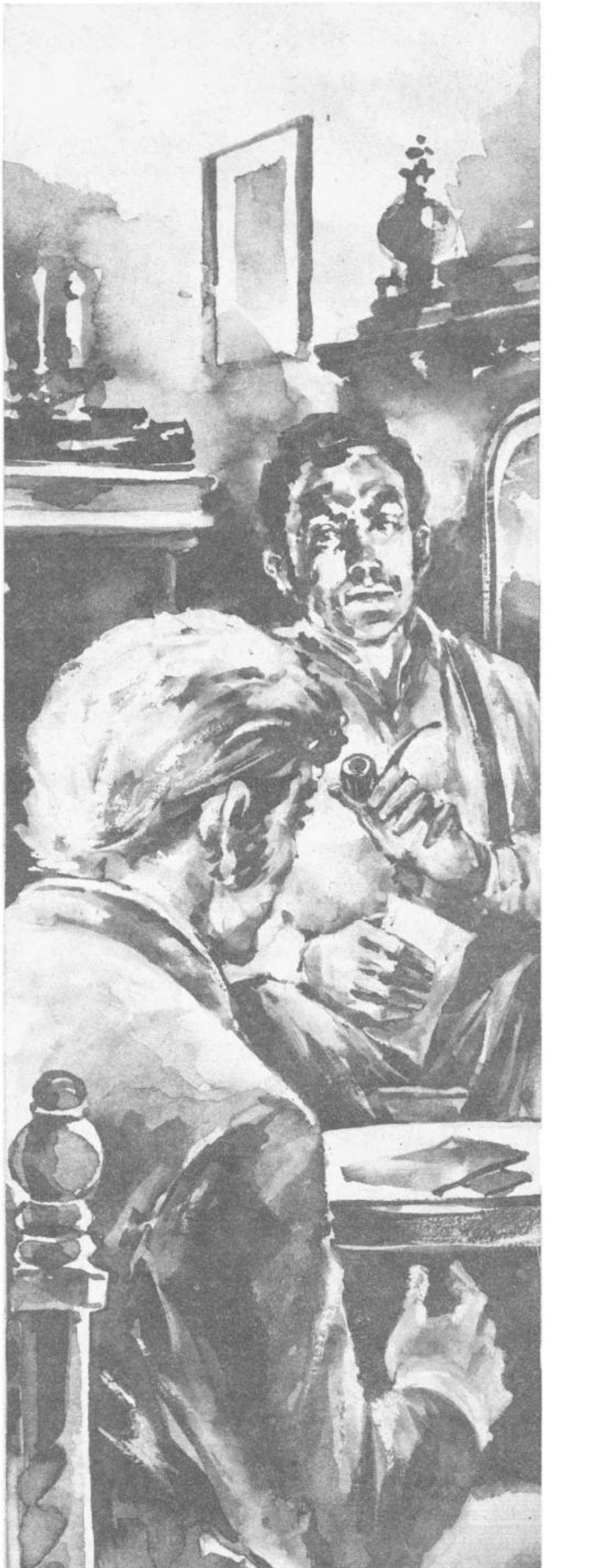

# আবিষ্কার করুন ব্যাটারির অপরিসীম শক্তি - নিপ্পো

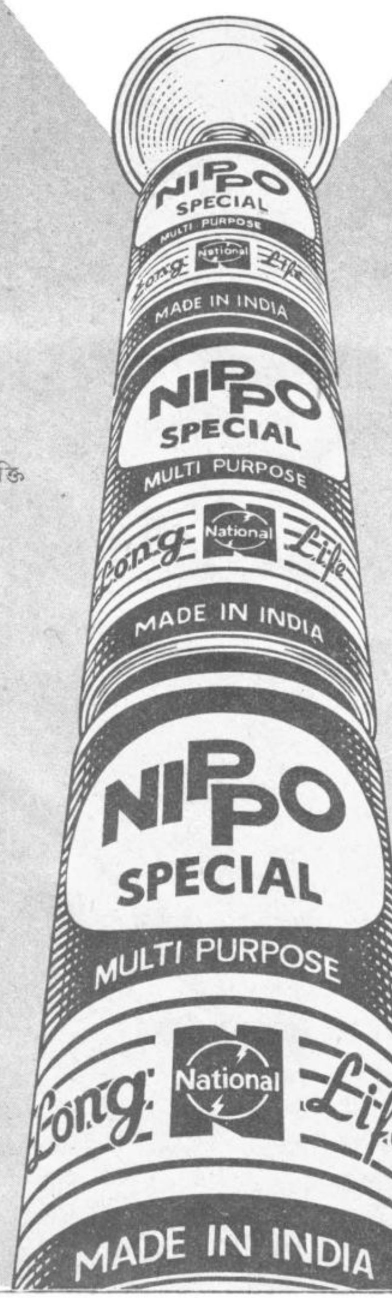


খাস জাপানের নামজাদা "ন্যাশনাল" মানেই বিশ্বের পয়লা নম্বর কারিগরী. তারাই বানায় নিপ্পো ব্যাটারি। আপনার কিনবার পক্ষে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ড্রাই সেল হল এগুলিই— আপনি নিশ্চয় আপনার নামী দামী সরঞ্জামগুলিতে যে কোন অন্য ব্যাটারি ব্যবহার করতে ভরসাই পাবেন না ?

- উপরে সীলবন্ধ থাকাই গ্যারাণ্টি দেয় এ ফ্যাক্টরি থেকে সদ্য বেরনো টাট্‌কা শক্তি
- আই এস আই মার্ক আপনাকে দেয় সেরা গুণমানের প্রতিশ্রুতি
- ধাতু দিয়ে মোড়া বলে লীক্ করার ভয় থেকে পুরোপুরি সুরক্ষা
- প্রত্যেকটি ব্যাটারি আপনার হাতে পৌঁছয় খুঁটিয়ে পরীক্ষার পর

**নির্ভরযোগ্য শক্তির সম্পূর্ণ সম্ভার**

- নিপ্পো হাই-টপ • নিপ্পো সুপার
- নিপ্পো হাইপার • নিপ্পো স্পেশাল
- নিপ্পো পেনলাইট

National নিপ্পো
ব্যাটারি

টেকনিক যার খাস জাপানের ন্যাশনাল হতে আর এর শক্তিশালী ব্যাটারি তৈরি হয় ভারতে

everest/84/INL/137-bn

চাই। সে কথা থাক। এখন এই চিঠিটা থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত করতে পার বলো।"

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠির কাগজ আর হাতের লেখা পরীক্ষা করে হোমসকে নকল করে বললুম, "এই চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি খুব ধনী লোক। এ চিঠির কাগজ যেরকম পুরু আর শক্ত তাতেই বোঝা যায় যে এটা দামি কাগজ।"

"ঠিক বলেছ। কাগজটা খুব পুরু আর শক্ত। আসলে এটা কোনো ব্রিটিশ কোম্পানির তৈরি কাগজই নয়। কাগজটা আলোর সামনে ধরো তো।"

কাগজটা আলোর সামনে ধরতেই নজরে পড়ল কাগজের মধ্যে জলছাপে প্রথমে বড় হাতের E ছোট হাতের g তারপরে বড় হাতের P আর সব শেষে বড় হাতের G আর ছোট হাতের t লেখা।

"এর থেকে কী বুঝলে?" হোমস আমাকে জিজ্ঞেস করলে।

"হয় প্রস্তুতকারকের নাম না-হয় তার মনোগ্রাম।"

"না, তা নয়। Gt হচ্ছে জার্মান Gesellescháft-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, মানে 'কোম্পানি'। ইংরেজিতে যেমন আমরা Co লিখি তেমনি। P হচ্ছে Papier কাগজ। এখন Egটা কী হতে পারে? দেখি তো কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ারখানা," বলতে বলতে হোমস বইয়ের শেলফ থেকে একটা মোটা বই নিয়ে এসে তার পাতা ওলটাতে লাগলে। "এগলো . . . . এগলোনিৎস . . . . এই যে পেয়েছি এগরিয়া। 'বোহেমিয়ায় একটা জার্মানভাষী অঞ্চল। কার্লসবাডের খুব কাছে। জায়গাটা ভালেনস্টাইনের হত্যাস্থল বলে পরিচিত। এছাড়াও বহু কাঁচের কারখানা ও কাগজের কল আছে।' কী বন্ধু, কেমন হল?" খুশিতে আটখানা হয়ে হোমস একমুখ পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে দিলে।

"তাহলে বোঝা গেল কাগজটা বোহেমিয়ায় তৈরি।" আমি বললুম।

"হ্যাঁ। আর এই চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি জার্মান। এই যে লিখেছেন 'আপনার এই দক্ষতার কথা আমরা শুনেছি অনেক জায়গা থেকে'—এই ধরনের বাক্য জার্মান ভাষারই বিশেষত্ব। কোনো ইংরেজ, ফরাসি বা রাশিয়ান এ ধরনের বাক্য লিখবে না। এখন প্রশ্ন হল এই জার্মান ভদ্রলোক যিনি বোহেমিয়ায় তৈরি কাগজে চিঠি লেখেন, মুখোশের আড়ালে মুখ ঢাকতে পছন্দ করেন তিনি আমাদের কাছে কী চান। আর, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো ঐ তিনি আসছেন।"

হোমসের কথা শেষ না হতেই আমাদের বাড়ির সামনের ফুটপাথ ঘেঁষে খপখপ আওয়াজ করতে করতে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামায় হোমস শিস দিয়ে উঠল।

"শব্দ শুনে মনে হল দু-ঘোড়ায় টানা গাড়ি" বলে হোমস জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। "ভারী সুন্দর একটা ছোট্ট ব্রুহাম গাড়ি। বুঝলে ওয়াটসন, ঘোড়া দুটোর তুলনা মেলা ভার। এক একটার দাম কম করে দেড়শো গিনি হবে। আর কিছু থাক বা না থাক এই তদন্তে টাকার কমতি হবে না।"

আমি বললুম, "আমি তাহলে এখন চলি।"

"একদম নয়। যেখানে আছ ঠিক সেইখানেই বসে থাকো। তুমি হচ্ছ আমার বসওয়েল। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে কী করে? আর তা ছাড়া মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং হবে। তুমি যদি এখন চলে যাও তো পরে তোমাকে হয়তো পস্তাতে হবে।"

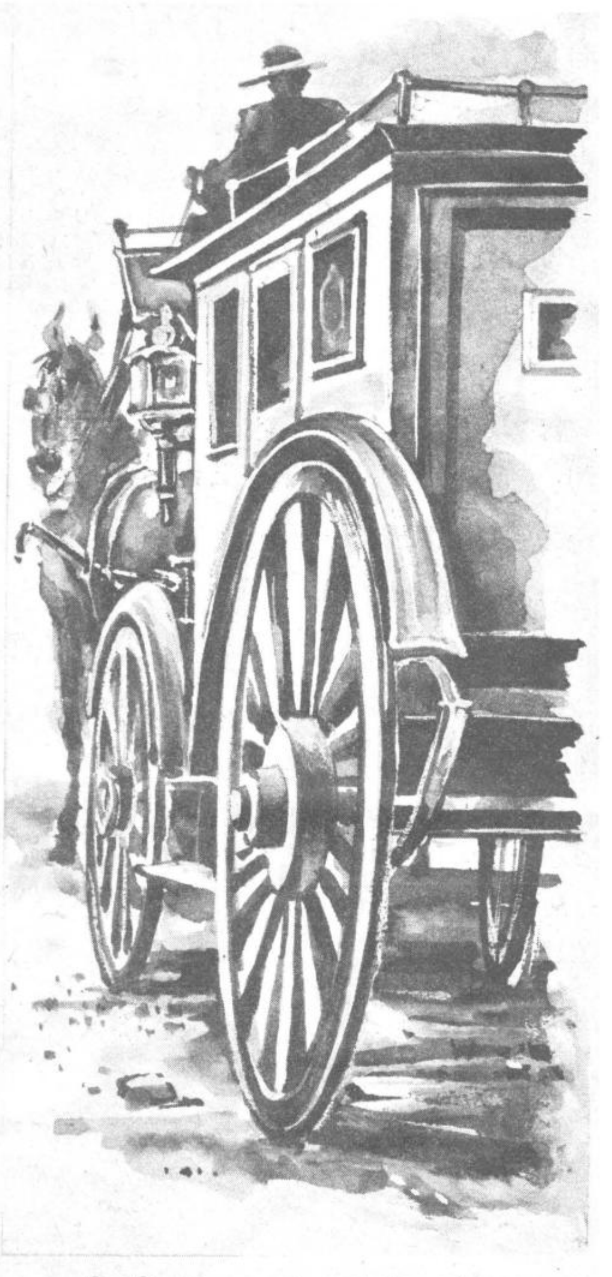

"কিন্তু তোমার মক্কেল—"

"তার কথা বাদ দাও। তোমার সাহায্যের প্রয়োজন আমারও হতে পারে আবার তারও হতে পারে। অতএব ঐ চেয়ারটাতেই বসে থাকো আর সব কথা মন দিয়ে শোনো।"

এতক্ষণ সিঁড়িতে যে ধীর অথচ ভারী পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল তা আমাদের দরজার কাছে এসে থেমে গেল। আর তারপর দরজায় বেশ জোরে টোকা পড়ল।

হোমস বললে, "ভেতরে আসুন।"

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

**অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন**

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

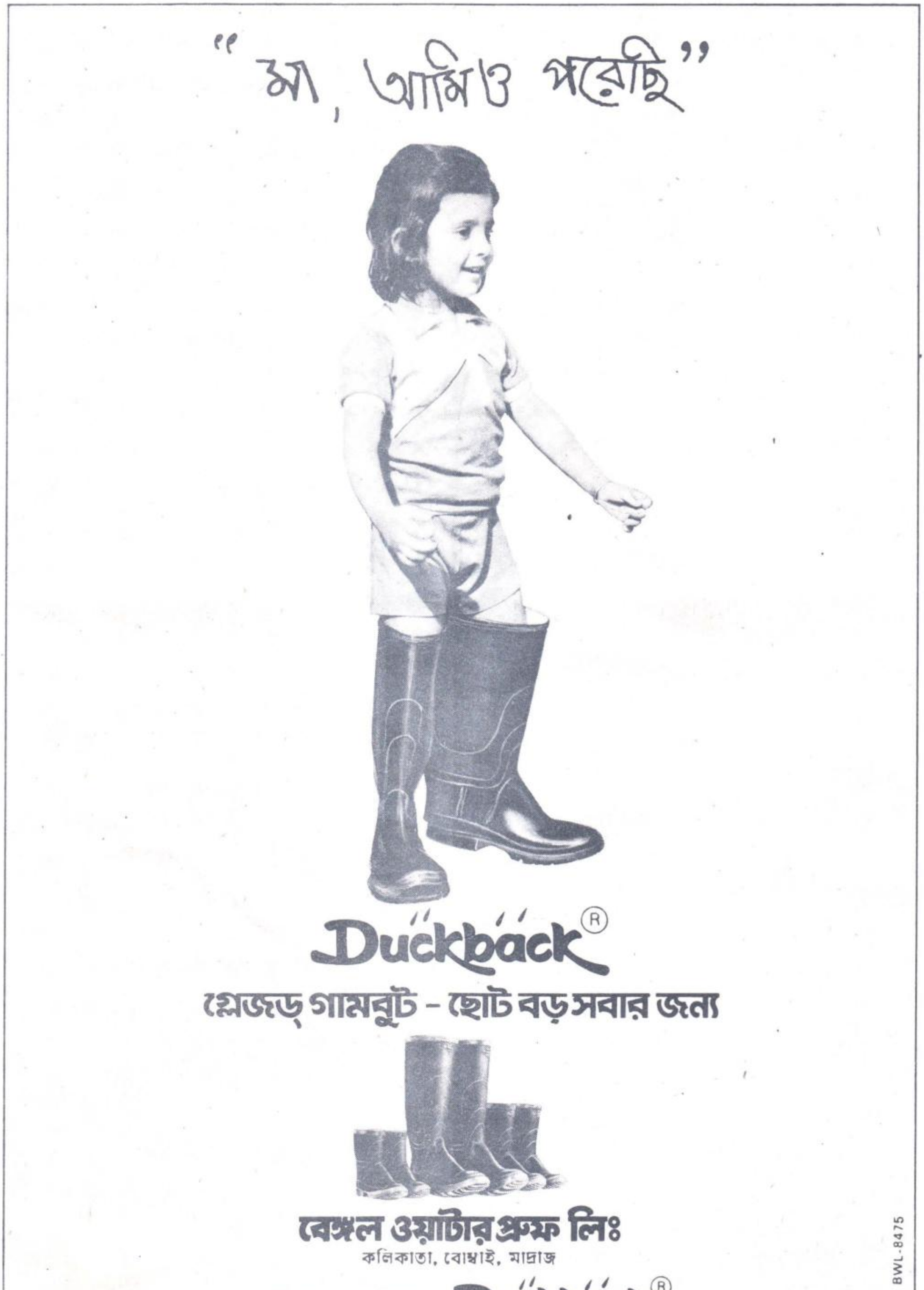
"মা, আমিও পরেছি"
Duckback®
গ্লেজড় গামবুট – ছোট বড় সবার জন্য
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ
সবার সুরক্ষায় Duckback®
naa BWL-8475

॥ ১৯ ॥

# ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে আছেন আব্বাস। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে আছে। মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বললাম, "দেখি তো ভেতরটা।" আব্বাস হাঁ করতেই চমকে উঠলাম আমি। সর্বনাশ! এত রক্ত পড়ছে! ওপরের ঠোঁটের নীচে মাড়ি অনেকটা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে দরদর করে। সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলাম মুখ। ঠোঁট পেরিয়ে রক্ত এবার আমার আঙুলের ভেতর দিয়ে মাটিতে ঝরতে লাগল। আব্বাস গোঙাচ্ছেন। এক্ষুনি হাসপাতালে

আব্বাস আলি বেগ

পাঠাতে হবে।

ততক্ষণে আম্পায়ার, সি এ বি-র নির্দেশে অ্যাম্বুলেন্সের লোকজন এসে গেছেন মাঠের মধ্যে। ধরাধরি করে বেগকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে সোজা হাসপাতাল। অনেকগুলো সেলাই পড়েছিল আব্বাস আলি বেগের মাড়িতে। সে খবর পরে পেয়েছিলাম। আহতকে মাঠ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সময় আমিও কিছুক্ষণের জন্য মাঠের বাইরে গিয়েছিলাম, হাত ধুয়ে নিতে। হাতের ওপর বেগের টাটকা রক্ত। আমার গাটা শিরশির করে উঠছিল। এই কি ক্রিকেট! এই রক্তারক্তির জন্য, এই বর্বরতার জন্যই কি আমরা মাঠে নেমেছি? অনুশোচনায় আমার মন দগ্ধ হচ্ছিল। গিলক্রিস্ট অভদ্রতা করেছে বলে আমরা করব কেন? ক্রিকেট তো ভদ্রলোকের খেলা। খেলার রাজা ক্রিকেট। সৌজন্যে, শিষ্টতায় অতুলনীয়। তার মধ্যে নিষ্ঠুরতার কোনো জায়গা নেই। সত্যি সত্যিই তো আমরা আব্বাসের রক্ত চাইনি। গিলক্রিস্টের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে চেয়েছিলাম শুধু। সেঞ্চুরি তার বেয়াড়াপনার যথেষ্ট জবাব দেওয়া হয়েছে। সামান্য বোধ থাকলে, গিলক্রিস্ট লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর এ কী হল! কেন কিংকে আমি বাউন্সার দেওয়ার অনুমতি দিলাম!

মাঠে ফিরে অবিলম্বে লেস্টার কিংকে কাছে ডেকে নিলাম। গিলির দলের লোককে ঘায়েল করতে পেরেছে, এই আনন্দে কিং তখন ডগমগ। খুব উৎসাহের সঙ্গে দৌড়ে এল সে। ভেবেছিল বোধহয় আমি তাকে এর জন্য অভিনন্দন জানাব এবং এইরকম আরও বাউন্সার দেওয়ার জন্য বলব। "অনেক হয়েছে লেস্টার, এবার থেকে আর একটিও বাউন্সার নয়।" কিং বোধহয় ভাবতেই পারেনি, আমি তাকে এমন কথা বলব। সে অবাক হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। "কেন, এখনই নয় কেন? প্রতিশোধ তো পুরো নেওয়া হয়নি। বিমার-বাউন্সার গিলি একাই ছাড়তে জানে না, সেটা ও বুঝুক। দলের আধখানাকে কেবল ও নিজেই হাসপাতালে পাঠাতে পারে নাকি!"

বুঝলাম, কিং ভীষণভাবে উত্তপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু গিলির দোষে ব্যাটসম্যানেরা ভুগবে, এটাই বা কেমন কথা! আর তাছাড়া, সব চাইতে বড় ব্যাপার, আমরা রেষারেষিতে খেলাকে কোথায় নিয়ে চলেছি! মুখ শক্ত করে বললাম, "গিলক্রিস্টকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্রিকেটকে আর কলঙ্কিত করতে পারি না। তোমার মনস্তত্ত্ব পুরোপুরি বুঝতে পারছি। তবু তুমি আর একটিও বাউন্সার দেবে না।"

লেস্টার কিং কী ভেবেছিল তা জানি না, বাকি খেলায় সে আর বিমার বা বাউন্সার দেয়নি। দলপতির নির্দেশ সে পালন করেছিল।

বাংলার প্রথম ইনিংস ৩৮৬ রানে শেষ হয়েছিল। উত্তরে হায়দরাবাদ ৩৬১ রান করল। অর্থাৎ প্রথম ইনিংসের সুবাদে ২৫ রানে এগিয়ে ছিলাম আমরা। হায়দরাবাদের

# নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন

# সানলাইট

## ডিটারজেন্ট পাউডার

### আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

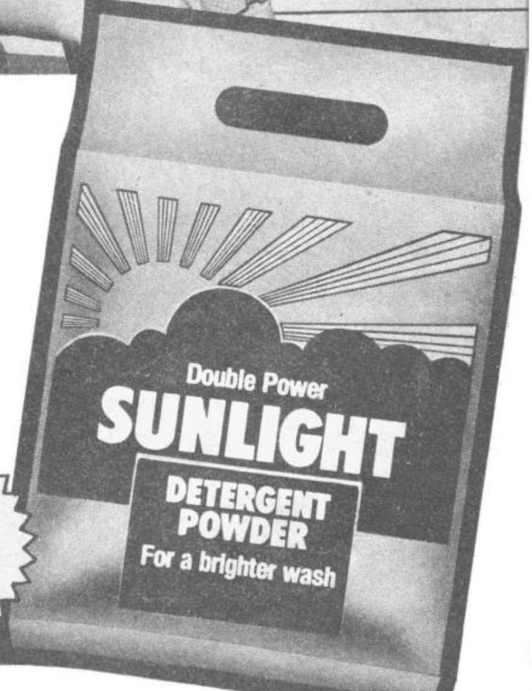


## আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

ইনিংসের শেষপর্বে ভীষণ টেনশানে ভুগেছিল বাংলার সবাই। অধিনায়ক হিসাবে আমার অবস্থা যে তখন কী, তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। এক-একবার মনে হচ্ছিল, হায়দরাবাদ বাংলার রানসংখ্যাকে টপকে যাবে নির্ঘাত। যদি ওরা আমাদের রানসংখ্যাকে পেরিয়ে যেতে পারত তবে বাংলার অবধারিত হার। এই ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে ছিলাম সকলে। আর ঈশ্বরের কাছে অবিরাম প্রার্থনা করছি, মুখ রেখো প্রভু। আমরা যেন কানপুরের অপমানের শোধ নিতে পারি। তারপর, ওদের ইনিংস আমাদের চেয়ে পঁচিশ রান কমে শেষ হতে আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কেটে গেল। ম্যাচের ষাটভাগ এখন বাংলার দখলে।

দুর্ভাবনা অনেকটা কেটে গেল বললাম এই কারণে যে, দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা তখনও বাকি। এ-ক্ষেত্রে যদি একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে যায় তবে হায়দরাবাদের পক্ষে প্রথম পর্বের গ্লানি কাটিয়ে উঠে জয়ের মুখ দেখা অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয় ইনিংসে আমি আর ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে পারলাম না। ক্লান্তিতে শরীর একেবারে ভেঙে আসছিল। আগের দিন রাতে ঘুম হয়নি। আমার এক বোন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সারারাত তার শুশ্রূষা করতেই রাত ভোর হয়ে গেছে। ভোরের দিকে তাকে যখন একটু সুস্থ মনে হল তখন আর একটু গড়িয়ে নেওয়ারও সময় নেই। হাত-মুখ ধুয়ে দাড়িটাড়ি কেটে স্নান সেরে মাঠে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগলাম।

ক্লান্তি-অবসাদ শরীরকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ধরেছে। বিনিদ্র রজনীর পর ক্রিকেটের অনুভূতি কেমন, যাঁরা খেলেছেন (যাঁদের এমন দুর্ভাগ্য হয়েছে) তাঁরাই জানেন। মাঠে এসে প্যাভিলিয়নে খুলে বললাম সব। তারপর টান হয়ে শুয়ে পড়লাম টেবিলের ওপর। অন্য কেউ ওপেন করতে যাক। আমি পরে নামব। জানতাম, ঘুম আসবে না। প্যাভিলিয়নের হৈ-হট্টগোলে কারও ঘুম হয় না। আমি ঘুমোতেও চাইছিলাম না। শরীর একেবারে আনফিট হয়ে যাবে এ-সময় ঘুমোলে। মেরুদণ্ড সোজা করে বিশ্রাম করছিলাম।

শুয়ে শুয়েই শুনছি, বাংলার খেলোয়াড়দের চেঁচামেচি ক্রমশ কমে আসছে। তার খানিক পরে, ফিসফিসানি চলছে কেবল। ভাবলাম, বুঝি সব বাইরের চেয়ারে বসে খেলা দেখছে। ঘরে হয়তো দু-একজন আছে। তারা আমাকে বিশ্রাম নিতে দেখে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল নিচু গলায়। হঠাৎ কিছু আক্ষেপসূচক শব্দ, আর "আরেকটাও গেল" এই কথাটা শুনে আমি উঠে বসলাম। আরেকটাও গেল—মানে, আমাদের কটা উইকেট গেছে? দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনের মধ্যে বিপদের ছায়া দুলছে। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই। তিনটি উইকেট গেছে। নতুন ব্যাটসম্যান আমার সামনে দিয়ে মাঠে চলে গেল, খুব চিন্তিত আর ভয়ার্তমুখে। গিলক্রিস্ট বাংলাকে ধসিয়ে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। স্কোরবোর্ডের অবস্থা খুব শোচনীয়। ভাল রান করা দূরের কথা, ঝড়ের মুখে কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে বাংলার ব্যাটসম্যানরা। আর দেরি করা ঠিক নয়। তাহলে এই ধস ঠেকানো যাবে না কিছুতেই। জামা-প্যান্ট তো পরাই ছিল, ঘরে ঢুকে দ্রুত হাতে প্যাড পরে নিলাম। এবার আমি যাব। (ক্রমশ)

# সুয্যিমামার ছুটি

## বিমলকান্তি বিশ্বাস

নাই রবি তো নাইরোবিতে
দিবসনিশি কিরণ দিতে
আছে সেথায় শুধুই মাত্র চন্দ্র।
পুজোর ছুটির সুযোগ নিয়ে
চাঁদের হাতে রাজ্য দিয়ে
সুয্যিমামা গেছেন চলে অন্ধ্র।
নাগার্জুন সরসী-তীরে
বেড়ান মামা ঘুরে-ফিরে
বাতানুকূল রাজভবনে বাসা।
মৃদুমন্দ বাতাস বয়
জীবন যেন ছন্দোময়
ব্যবস্থা সব বড্ডরকম খাসা।
খবরটা খুব টপসিক্রেট
করতে পারে প্যানিক ক্রিয়েট
সবার যেন না হয় এটি জানা।
ভাগ্নেরা তাঁর প্রিয় অতি
তাই দিয়েছেন অনুমতি
জানতে তাদের নেইকো কোনো মানা।
অবশিষ্ট জগৎ চলে
এখন তবে কিসের বলে
জানতে যদি ইচ্ছে খুবই করে,
জানাচ্ছি তা খুব গোপনে,
আমার সকল ভ্রাতৃজনে
চলছে মামার গুডউইলের জোরে।

ছবি : দেবাশিস দেব

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!" — ফেভি ফেয়ারী

চট্‌পট্‌ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর** ।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক ।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা-হাতি-বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর** ।

OBM-3033 BN

## তোমার দরকার হবে :

- শক্ত কার্ডবোর্ড
- নরম কার্ড
- ভেলভেট কাগজ (কালো, নীল, হলদে)
- খয়েরী রঙের কাগজ
- তূলো বা স্পঞ্জ
- সাদা সিল্ক দড়ি
- সাটিনের সূক্ষ্ম রিবন
- ধাতুর বড় রিঙ (4″ বেড়)
- ফেভিকল এম-আর অ্যাডহীসিভ

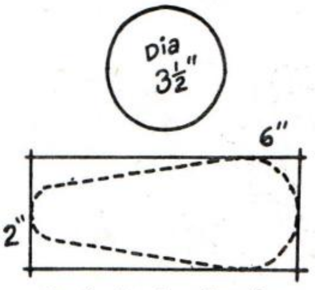


১. ৪-টে কার্ডবোর্ড কেটে তার টুকরো দিয়ে বাহু ও পা আর গোল ক'রে কেটে মুখ বানাও, যেমনটি দেখানো হয়েছে ।

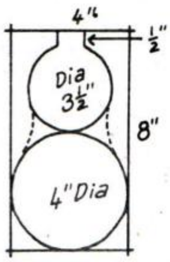


২. শক্ত কার্ডবোর্ডটি কেটে দেহ বানাও (যে আকারের দেখানো হয়েছে) । দেহ, হাত ও পায়ের ওপর তূলো বা উল/স্পঞ্জ সেঁটে দাও আর কালো ভেলভেট কাগজ দিয়ে চাপা দাও ।

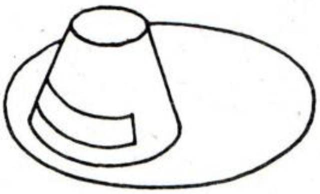

৩. নাকের জন্যে নীল ভেলভেট কাগজ দিয়ে কোন্ তৈরী ক'রে মুখের ওপর সেঁটে দাও । কোন্-এর ডগাটি কেটে নিয়ে তার ওপর একটা গোলাকার হলদে কাগজ সেঁটে দাও—নাক তৈরী হয়ে গেল । অর্দ্ধ-গোলাকার একটা কালো ভেলভেট কাগজ হ'ল মফি-র মুখ ।

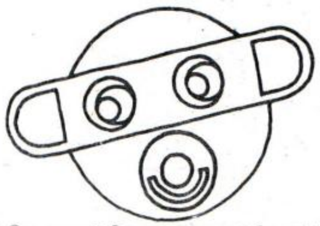

৪. নীল ভেলভেট দিয়ে মোড়া নরম কার্ডের একটা লম্বা ফালি তার নাকের ওপর বসাও । ঐ ফালির দু-ধারে হলদে কাগজ সেঁটে দাও, কানের জন্যে । কালো ভেলভেট ও সাদা কাগজ দিয়ে চোখ তৈরী ক'রে ফালির ওপর সেঁটে দাও ।

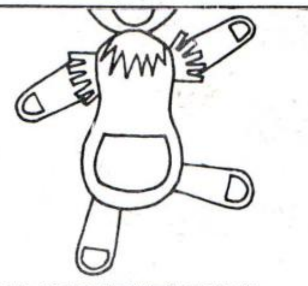

৫. এবার দেহ, পা, হাত আর মুখ একের পর এক সেঁটে দাও, যে ভাবে দেখানো হয়েছে । পায়ের পাতা, হাত, শর্টস ও অ্যাপ্রনের জন্যে নীল ফেল্ট পেপার কেটে নিয়ে সেগুলো জুড়ে দাও— যে ভাবে দেখানো হয়েছে।

৬. স্কার্টের হাতা ও কলারের জন্যে হলদে ঝালোর কেটে নাও । তার গলা ও কোমরে জড়ানোর জন্যে সিল্কের সাদা দড়ি দিয়ে তৈরি কর সুন্দর বো । কব্জি, পায়ের গোছ আর ঘাড়েও ঐ রকম বো সেঁটে দাও ।

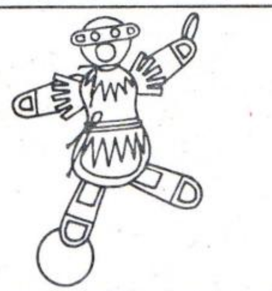

৭. বাঁ হাতের পেছনে ফাঁস দিয়ে রিবন সেঁটে দাও ডান পায়ের পাতার পেছনে রিঙ-এর মত রিবন সেঁটে দাও । মফি-র পেছনে খয়েরী রঙের কাগজ সেঁটে দাও ।

কিচ্-মিচ্, কিচ্-মিচ্ ! এখন তোমার ন্যাপ্‌কিনে দোলা-র জন্যে মফি-বাঁদর তৈরী !

**ফেভিকল** এম-আর

সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

**সেরা জিনিস গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও**

® Both ® and **FEVICOL** brand are the
Registered Trade Marks of PIDILITE INDUSTRIES PVT. LTD., Bombay 400 021

ফ্ল্যাশ গর্ডন
আগুনের হলকায় কাবু হয়ে পড়েছে ফ্ল্যাশের সঙ্গী বিরো...
জানালা খোলো ! বাতাস আসুক !
তার চেয়ে বরং বোমাটা দাও !
বোমা হাতে এগিয়ে গেল ফ্ল্যাশ...
ছুঁড়ে মারল সামনে !
জানালা চুরমার !
পক্ষী-মানবদের সঙ্গে নিয়ে ফ্ল্যাশ এগিয়ে আসছে...
জয় হবেই !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

# ইউরোপীয় ফুটবলে ফ্রান্সই সেরা

সুব্রত সিংহ

১৯৮৪-র ইউরোপীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সের দুর্বার গতির কাছে স্পেনকে পরাস্ত হতে হল। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই ফ্রান্স দাপটের সঙ্গে খেলে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবারের প্রতিযোগিতা ছিল ইউরোপীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সপ্তম আসর। এর আগে যে ছটি প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে, তাতে কেবলমাত্র স্পেন ও ইতালি ছাড়া আর কোনো দেশ নিজেদের দেশের মাটিতে এই প্রতিযোগিতা জয় করতে পারেনি। এবার তৃতীয় দেশ হিসাবে এই কৃতিত্বের অধিকারী হল ফ্রান্স।

ফ্রান্সের আশি বছরের ফুটবল-ইতিহাসে এই চুরাশির জুন মাসের ২৭ তারিখটি নিঃসন্দেহে একটি স্বর্ণময় দিন হিসেবে চিহ্নিত হবে। কেননা এই প্রথম একটি আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে ফরাসিরা বেশ বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করল। ১৯৮২-তে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ-প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকেও অভিজ্ঞতার অভাবে তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সেই হারের দুঃখকে এই সাফল্য এতদিনে কিছুটা হয়তো লাঘব করতে পেরেছে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ফাইনাল রাউণ্ডে যে আটটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তাদের মধ্যে সাতটি দলকে বাছাই-পর্বের গণ্ডি ডিঙিয়ে আসতে হয়েছিল। উদ্যোক্তা দেশ হিসাবে ফ্রান্স সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবারে বাছাই পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের সংখ্যা ছিল বত্রিশ। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হল, বিশ্বকাপ-জয়ী ইতালির ওই বাছাই পর্ব থেকেই বিদায়। ওই গ্রুপ থেকে ফাইনাল পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়েছিল রুমানিয়া। যে আটটি দল ফাইনাল পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়েছিল, তারা হল গতবারের বিজয়ী পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া।

এই আটটি দলকে নিয়ে দুই গ্রুপে ভাগ করে খেলানো হয়। দুই গ্রুপের প্রথম দুটি করে দল সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। সেমিফাইনালে যে চারটি দল পৌঁছেছিল, তারা হল ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন ও ডেনমার্ক। সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ফলাফলটি হল, পশ্চিম জার্মানির সেমিফাইনালে না পৌঁছতে পারা।

বিজয়ী ফ্রান্স দল। সামনের সারির একেবারে ডাইনে দেখা যাচ্ছে প্লাতিনিকে

মিশেল প্লাতিনি

ফ্রান্সের এই বিরাট সাফল্যের পিছনে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন দলের অধিনায়ক ও ১৯৮৩-র 'শ্রেষ্ঠ ইউরোপিয়ান ফুটবলার' হিসাবে নির্বাচিত মিশেল প্লাতিনি। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্বকে বজায় রাখতে এই দুর্ধর্ষ মিডফিল্ডারটি এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। এই প্রতিযোগিতায় পাঁচটি ম্যাচে (গ্রুপ লিগের তিনটি, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল) তিনি মোট নটি গোল করে প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পান। তা ছাড়া বেলজিয়াম ও যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে দুটি হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্বও তাঁরই।

এই নটি গোল করার সুবাদে আপাতত বাহান্নটি আন্তর্জাতিক খেলা খেলে তাঁর দেওয়া গোলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ। বর্তমানে তিনি ফরাসি ফুটবলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা। এর আগে এই রেকর্ড ছিল জুস্ত ফঁতেইনের। ১৯৬০ সাল থেকে ফঁতেইনের সাতাশটি গোলের যে রেকর্ড এতদিন অম্লান ছিল, তা প্লাতিনি স্পর্শ করেন এই প্রতিযোগিতার গ্রুপ লিগের

## সত্যজিৎ রায়ের

নতুন বারোটি গল্পের তরতাজা সংকলন

# এবারো বারো

দাম ১২·০০

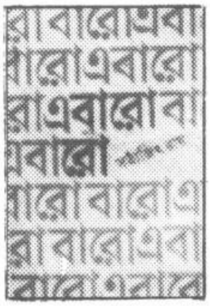

এক ডজন গপ্পো, আরো এক ডজন ও আরো বারো—এই তিনটি গল্পের বইয়ের পর নতুন বারোটি গল্প নিয়ে 'এবারো বারো'। ফেলুদার রহস্য-অ্যাডভেনচারের দু-দুটো বিশাল কাহিনী ছাড়াও এ-বইতে রয়েছে আরো দশটি দুর্দান্ত রসের মন-ভরানো গল্প। অন্য গল্পগ্রন্থগুলির মতো এ-বইয়েরও প্রত্যেকটি গল্প ছবিতে সাজিয়েছেন সত্যজিৎ রায়, এঁকে দিয়েছেন দারুণ একটি প্রচ্ছদপট।

**গত এক বছরে অনেকগুলো নতুন বই বেরিয়েছে তোমাদের জন্য। সেগুলোর নাম কেউ-কেউ নিশ্চয়ই জানো। কিনেও ফেলেছো অনেকে। যারা জানো না কিংবা কেনো নি এখনো, তাদের জন্য নীচের তালিকা।**

**শৈলেন ঘোষের**
ইতিমিচি সাহেব ১০·০০

**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের**
খালি জাহাজের রহস্য ১২·০০

**নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের**
সমগ্র কিশোর সাহিত্য ৩য় খণ্ড ২৫·০০

**পূর্ণেন্দু পত্রীর**
কলকাতার গল্পসল্প ৮·০০

**শঙ্করীপ্রসাদ বসুর**
কৃষ্ণ ১০·০০

**সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের**
কলকাতার নিশাচর ১০·০০

**সুনির্মল বসুর**
শহুরে মামা ও কানাকড়ি ১০·০০

**পার্থসারথি চক্রবর্তীর**
ছোটদের বিজ্ঞানকোষ ৫৫·০০

**বুদ্ধদেব গুহের**
ঋভুর শ্রাবণ ১০·০০

**তারাপদ রায়ের**
ডোডো-তাতাই পালা কাহিনী ৮·০০

**বিমল মিত্রের**
কে? ১৫·০০

**অরূপরতন ভট্টাচার্যের**
জ্যোতির্বিজ্ঞানের ডায়ারী ৭·০০

**শুধু ছোটদের জন্য আনন্দ পাবলিশার্স-এর ঝলমলে বইয়ের দোকান ৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯ ঠিকানায়**

**প্রেমেন্দ্র মিত্রের**
ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস ৩৫·০০

**বিমল করের**
কিশোর ফিরে এসেছিল ১০·০০

**লীলা মজুমদারের**
সব ভুতুড়ে ১৬·০০

**সমরেশ বসুর**
গোগোল চিক্কুস নাগাল্যাণ্ডে ১২·০০

**সমরেশ মজুমদারের**
খুনখারাপি ১২·০০

**শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের**
নৃসিংহ রহস্য ১০·০০

**রমাপদ চৌধুরীর**
ভূতগুলো সব গেল কোথায় ২০·০০

**দেব সেনাপতির**
বানানের ছড়া ৮·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। ফোন ৩৪-৪৩৬২

প্রথম খেলায় ডেনমার্কের বিরুদ্ধে গোল করে। এরপর তিনি ওই রেকর্ডটি ভেঙে দেন পরের ম্যাচেই বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে গোল করে।

পার্ক ডেস প্রিন্সেস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে হাজার পঞ্চাশেক দর্শকের সমর্থন নিয়ে ফ্রান্স খেলতে নেমেছিল। মাঠে ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁর উপস্থিতি ফ্রান্সের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

ফাইনাল খেলাটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হলেও খেলাটির মান যে-পর্যায়ে পৌঁছনো উচিত ছিল, সেই পর্যায়ে কিন্তু পৌঁছয়নি। চেকোস্লোভাকিয়ার রেফারি ক্রিস্তভ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে খেলাটি পরিচালনা করেন। দু'দলের দুজন করে খেলোয়াড়কে তিনি হলুদ কার্ড দেখান। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি কঠোর হয়েছিলেন খেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন ফ্রান্সের দীর্ঘকায় স্টপার রু-কে বিপজ্জনক খেলার জন্য তিনি মাঠ থেকে বার করে দেন। ফলে শেষ কয়েক মিনিট ফ্রান্সকে খেলতে হয়েছিল দশজনে।

খেলার প্রথমদিকে স্পেনের প্রাধান্য ছিল। তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক ফরোয়ার্ড ছিলেন স্ট্রাইকার কারলস্ সান্তিলানা। তবে ধীরে-ধীরে ফ্রান্স খেলায় ফিরে আসে এবং দ্বিতীয়ার্ধের সাতান্ন মিনিটে তাদের প্রথম গোলটি পায়। পেনাল্টি সীমানার বাইরে ফ্রি-কিক পেয়ে ফ্রান্সের অধিনায়ক প্লাতিনি ডান পায়ের বাঁক-খাওয়ানো শটে স্পেনের গোলরক্ষক আরকোনাডাকে পরাস্ত করে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন।

এরপর খেলার শেষ দিকে স্পেন যখন গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে ফ্রান্সের গোলে, ঠিক সেই সময় একটি প্রতি-আক্রমণ থেকে বল পেয়ে ফ্রান্সের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন লেফট উইঙ্গার ব্রুনো বেলোঁ।

খেলার শেষে ফ্রান্সের খেলোয়াড়রা সুদৃশ্য ট্রফিটি নিয়ে যখন মাঠ প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন সারা মাঠে আনন্দের বন্যা।

# বিল ভোস চলে গেলেন

## মণি শর্মা

১৯৩২-৩৩ ক্রিকেট মরসুম ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচাইতে বিতর্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ইংরেজ অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন সিরিজ জয় ও ব্রাডম্যানকে ঠাণ্ডা করার জন্য সেবারে 'লেগ থিয়োরি' প্রয়োগ করেছিলেন। সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে ক্রিকেট-বিশ্ব জুড়ে ঝড় উঠেছিল। দুই পেস বোলার হারল্ড লারউড ও উইলিয়াম ভোসকে অস্ত্র

হিসেবে ব্যবহার করে ব্যাটসম্যান ধ্বংসের যে মারাত্মক কৌশল জার্ডিন কার্যকর করেছিলেন, তা মানবিক ও ক্রিকেটের মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর কি না, এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত ছিল না। বিতর্ক আছে আজও।

ওই মরসুমে, বাধ্য সৈনিকের মতো সেনাপতি- জার্ডিনের আদেশ পালন করেছিলেন ভোস ও লারউড। ইংল্যাণ্ডের বোলিংয়ের দুই প্রধান শক্তি—একজন ডানহাতি, অন্যজন ন্যাটা। ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা তীব্র গতির বোলার ভোস মনে-মনে লেগ থিয়োরিকে ঘৃণা করতেন। সতীর্থ 'গাবি' অ্যালেন সফর চলাকালীন লেগ থিয়োরির প্রতি তাঁর বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। ভোস প্রকাশ করেছেন পরে, সফরশেষে। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, রণক্ষেত্রে সেনানায়কের যুদ্ধনীতির সমালোচনা করা ঠিক নয়। পরবর্তী কালে, খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর, লেগ থিয়োরির তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি।

কিছুদিন আগে এই খ্যাতিমান বোলারের জীবনাবসান ঘটেছে। টেস্ট-ক্রিকেটে ভোসের আবির্ভাব ১৯২৯—৩০ সালে। অধিনায়ক ক্যালথর্পের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ইংল্যাণ্ড-দলে ভোস অন্তর্ভুক্ত হন। দ্বিতীয় টেস্টেই জীবনের সেরা বোলিং-গড় তৈরি করে ফেলেন তিনি (৭/৭০)। তারপর থেকে তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। নিরবচ্ছিন্নভাবে না হলেও, '৪৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলে আক্রমণভাগের অন্যতম শক্তি হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। সাতচল্লিশে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টই তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট। মারাত্মক ইনসুইঙ্গারে সিদ্ধহস্ত ভোস টেস্টে সংগ্রহ করেছেন মোট আটানব্বইটি উইকেট। সাতচল্লিশে তাঁর নির্বাচনের পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ভোসের শত উইকেট লাভের সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বন্ধুদের প্রিয় 'বিল' নিজের সংগ্রহকে শতকের কোঠায় নিয়ে যেতে পারেননি।

ইংল্যাণ্ডের যত পেস-জুটি ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পেরেছেন, হেইগ-ভোস জুটি তাঁদের অন্যতম। পরে লারউড-ভোস জুটি অস্ট্রেলিয়াকে নাকাল করেছিলেন, সে-কথা তোমরা জানো। অনেকের ধারণা 'বডিলাইন সিরিজ'ই ভোসকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছে। হয়তো কথাটা সত্য। তবে এটাও ঠিক, ১৯৩২-৩৩ সিরিজটি বিতর্কিত না হয়ে উঠলেও, ক্রিকেটের ইতিহাসে ভোস তাঁর নিজের জন্য একটা জায়গা অবশ্যই করে নিতেন।

*দৌড়-অনুশীলন করছেন ভারতীয় হকি দল। বাঁ-দিকে একেবারে পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কোচ বালকিষেন সিং*

# ওলিম্পিক হকি ও ভারত

## চন্দ্রভানু

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আসরটির নাম ওলিম্পিক। ১৮৯৬ সালে গ্রীসের রাজধানী অ্যাথেন্সে বসেছিল আধুনিক ওলিম্পিকের প্রথম আসর। সেই আধুনিক ওলিম্পিক গেমসের ২৩তম আসর আগামী ২৮ জুলাই থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলিসে শুরু হচ্ছে। চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত।

ভারত এই প্রতিযোগিতায় যে কটি বিষয়ে অংশ নিচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হল হকি। বিশেষভাবে হকির কথা উল্লেখ করার কারণ হল, ভারত এ পর্যন্ত ওলিম্পিকের আসরে যোগ দিয়ে ১৪টি পদক পেয়েছে, তার মধ্যে ১১টি পদকই এসেছে এই হকির দৌলতে। বাকি তিনটির দুটি এসেছে অ্যাথেলেটিকস্ ও একটি কুস্তি থেকে।

১৮৯৬ সালে ওলিম্পিক গেমস শুরু হলেও ওলিম্পিকে হকির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল ১৯০৮ সালে লণ্ডন ওলিম্পিকে। মাঝে অবশ্য ১৯১২ ও ১৯১৬—এই দুটি আসরে হকি প্রতিযোগিতা হয়নি। তবে ১৯২০ সালে হকি আবার ওলিম্পিকে ফিরে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি ১৯০৮ সালে ইংল্যাণ্ড ও ১৯২০ সালে ব্রিটেনের একটি সম্মিলিত দল ওলিম্পিক হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়। কিন্তু ওলিম্পিক হকিতে ভারতের আগমন ঘটার পর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভারত ছিল একচ্ছত্র অধিপতি। ১৯২৮ সালে হল্যাণ্ডের আমস্টারডামে ওলিম্পিক হকির আসরে সর্বপ্রথম যোগ দেওয়ার পর ওলিম্পিক হকিতে ভারতই প্রভুত্ব করে গেছে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। এই সময় ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে তেমন কেউ ছিল না। ফলে সহজেই ভারত টানা ছয়টি ওলিম্পিকের আসরে হকি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ওলিম্পিকে ভারতীয় হকির একাধিপত্যকে খর্ব করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, ১৯৬০ সালে রোম ওলিম্পিকে। কিন্তু পরের আসরে, অর্থাৎ ১৯৬৪র টোকিও ওলিম্পিকে ভারত তার হৃত সম্মান ফিরে পেয়েছিল ওই পাকিস্তানকেই ফাইনালে হারিয়ে। কিন্তু এরপর ভারতকে ফের সোনা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল দীর্ঘ ষোল বছর। ১৯৮০-র মস্কো ওলিম্পিকে ভারত ফাইনালে স্পেনকে হারিয়ে সোনা পায়।

এবারের প্রতিযোগিতায় ভারত স্থান পেয়েছে 'ক' বিভাগে। এই বিভাগে অন্যান্য দেশ হল যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি ও মালয়েশিয়া।

এই বিভাগে শক্তিশালী দেশ হল অস্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম জার্মানি। সুতরাং সেমিফাইনালে যেতে হলে ভারতকে অসাধারণ ভাল খেলতে হবে।

উদ্যোক্তা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের প্রথম খেলা ২৯ জুলাই। ৩১ জুলাই মালয়েশিয়ার সঙ্গে, ২ আগস্ট স্পেনের সঙ্গে। ৪ ও ৬ আগস্ট ভারত খেলবে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে।

সুতরাং সেমিফাইনালে যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করছে ভারত কীরকম খেলে, পুরোপুরি তার উপর।

এবার একটু পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯২৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারত ওলিম্পিক হকিতে মোট পদক পেয়েছে ১১টি। এর মধ্যে সোনা ৮টি, রুপো ১টি ও ব্রোঞ্জ ২টি। আগেই উল্লেখ করেছি, ভারত টানা ছটি (১৯২৮-৫৬) ওলিম্পিকের আসরে হকি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়, এবং সোনা পায়। ১৯৬০-এ পেয়েছিল রুপো, এবং ১৯৬৮ ও ১৯৭২-এ ব্রোঞ্জ নিয়েই ভারতকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তবে ওলিম্পিক হকিতে ভারতকে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ১৯৭৬-এর মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে। ওই আসর থেকে ভারতীয় হকি দলকে শূন্য হাতেই ঘরে ফিরতে হয়েছিল।

হকিতে আপাতত যে আটটি সোনা ঘরে এসেছে, সেই সোনাজয়ী ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন যথাক্রমে জয়পাল সিং (আমস্টারডাম, ১৯২৮), লাল শাহ বোখারি (লস্ অ্যাঞ্জেলিস, ১৯৩২), ধ্যানচাঁদ (বার্লিন, ১৯৩৬), কিষেনলাল (লণ্ডন, ১৯৪৮), দিগ্বিজয় সিং বাবু (হেলসিঙ্কি, ১৯৫২), বলবীর সিং (মেলবোর্ন, ১৯৫৬), চরণজিত সিং (টোকিও, ১৯৬৪) এবং বাসুদেবন ভাস্করন (মস্কো, ১৯৮০)।

১৯৩২ সালে লস অ্যাঞ্জেলিস ওলিম্পিকে ভারত উদ্যোক্তা-দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ২৪—১ গোলে হারিয়েছিল। সেটি এখনও ওলিম্পিকে সর্বোচ্চ গোলে-জয়ের রেকর্ড হয়ে আছে।

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন
আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন...

# নেস্টাম: সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

**আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই** আপনার চাই। সেই **জন্যেই** আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান —যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

**যখন তার বয়স** প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত **আহারেরও প্রয়োজন**। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও **অত্যন্ত কোমল**। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

**প্রথম শক্ত** আহার হিসেবে নেষ্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে **অন্যান্য** যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল **সহজ** পাচ্য।

**দুধের সঙ্গে** প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ **খাদ্যে** পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমতা বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

## বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন:

নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

তৈরী করা খুব সোজা।

আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন। | নেস্টাম মিশিয়ে নিন। | এবার খেতে দিন।

# নেস্টাম

বেবি সিরিয়াল

দুধের সঙ্গে মেশান

NESTLÉ®

SAA/FSL/N/3150 BEN

SAA/FSL/N/3150 BEN

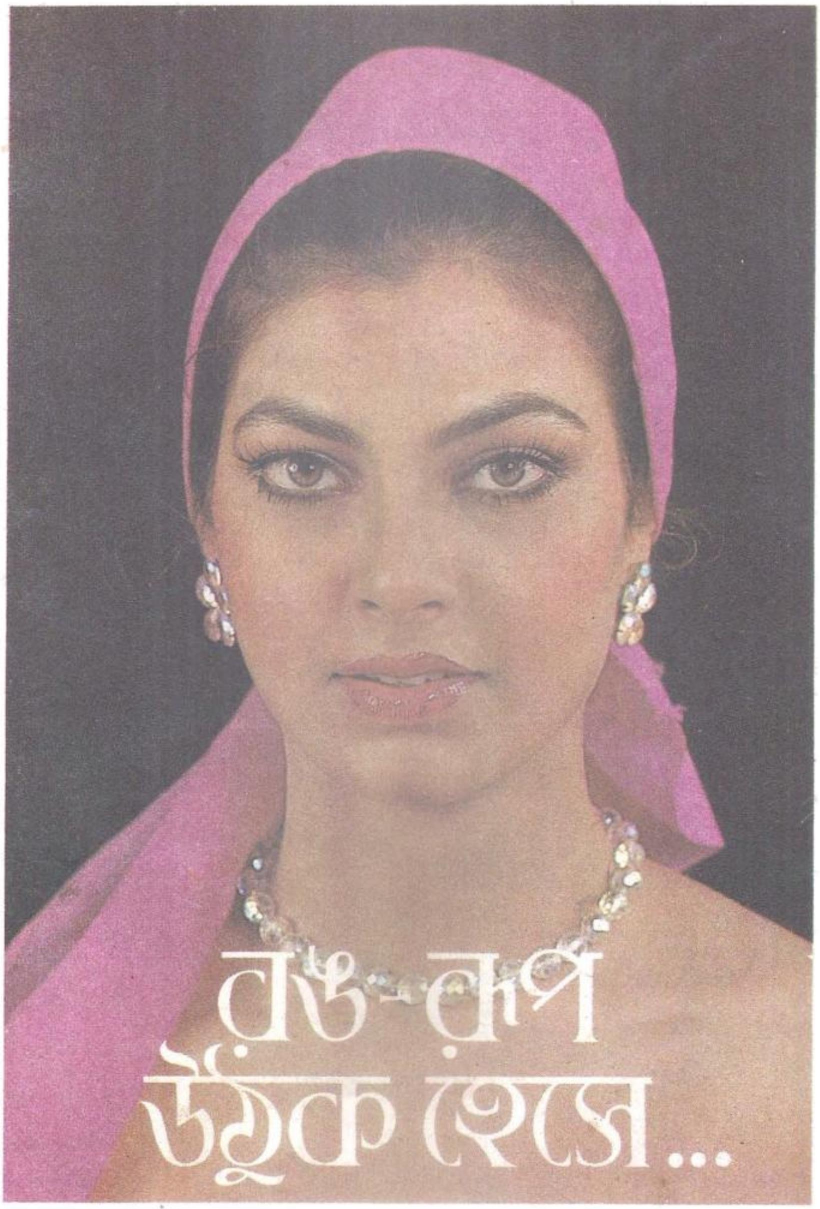

* ঘন ফেনা; মোলায়েম ত্বক
আর সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি

* দীর্ঘস্থায়ী মনমাতানো গন্ধ

# লাবণ্যের ছোঁয়া... প্রতিটি সাবানেই

প্রিক্স
টয়লেট সোপ

* ত্বকের প্রয়োজনীয়
সবরকম তেলের পরিচর্যা...
...হাজার ফুলের
সুরভী বয়ে আনে

SAA/ASC/5A BEN

অ্যাসকো-র আর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন (ASCO)